Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফিলিস্তিন মুসলিমদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জোনাকি আক্তার

রোলঃ 216021309227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফিলিস্তিন মুসলিমদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জোনাকি আক্তার

রোলঃ 216021309227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফিলিস্তিন মুসলিমদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জোনাকি আক্তার, আইডিঃ 216021309227বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফিলিস্তিন মুসলিমদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জোনাকি আক্তার

আইডিঃ 216021309227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

ফিলিস্তিনের ইতিহাস 2

ফিলিস্তিনে নবীদের স্মৃতি 9

বায়তুল মুকাদ্দাসের সূচনা 12

মুসলমানদের কাছে আল আকসার গুরুত্ব 15

কোরআনে বর্ণিত ফিলিস্তন প্রসঙ্গে আয়াত 22

হাদীসে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে 25

ফিলিস্তিন ভূখন্ড নিয়ে নবী মুহাম্মাদ সা: এর ভবিষ্যৎবানী 27

বিভিন্ন শাসনামলে আল আকসার সংস্কার 37

ফিলিস্তিনে ক্রুসেডার শাসন 40

সালাউদ্দীন আইয়ুবীর আল-আকসা জয় 42

ফিলিস্তিন পতনের সূচনা 44

ফিলিস্তিনের দুর্ভোগ জায়নিস্ট মুভমেন্ট 45

ইহুদীরা যে কারনে ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র চায় 47

ইহুদিদের ফিলিস্তিন দখল ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 48

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি বর্বরতা.. 52

হামাস 52

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিম রাষ্ট্র গুলো 58

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিম উম্মার করনীয় 64

ভূমিকা

ফিলিস্তিন! যার নাম শুনলেই বর্তমান সময়ের সংকট আর কিছু বর্বরতার চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। বোমা,বারুদ,রক্ত,শিশু, মানুষ কাতরানের কিছু চিত্র। এগুলা আমরা নিতে পারলেও ঠিকই রেগুলার ঘটনাগুলো ফিলিস্তিনিরা প্রত্যক্ষ করছে,

হচ্ছে বর্বরতার শিকার।ফিলিস্তিনের সেই গাজাবাসীরা আজকে দখলদারদের হিংস্রতার রোষানলে পড়ে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা বাকি মুসলমান ভাই বোনেরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কোন কিছুর করার নেই যেন! আচ্ছা, আমরা কি তবে ভুলে যেতে বসেছি যে ফিলিস্তিন আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ! ফিলিস্তিনের ইতিহাস আমাদের বারংবার মনে করিয়ে দেয় যে আকসা আমাদের, ফিলিস্তিন আমাদের। আল্লাহ তায়ালা ফিলিস্তিনের সেই ভূমিকে কতটা বরকতময় করেচেন তা ফিলিস্তিনের ইতিহাস পড়লে সহজেই অনুমেয়।

ফিলিস্তিন মুসলমানদের জন্য এক পবিত্র ভূমি,আছে অসংখ্য ইতিহাস। সে ইতিহাস যখন আমরা পুরোপুরি আয়ত্ত্ব করতে পারব ঠিক তখনি আমরা সেই ফিলিস্তিন আমাদের কতটা আপন সেটা অনুভব করতে পারবো। কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে ফিলিস্তিনের ভূমিকে নিয়ে বানী নাযিল করেছেন।যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তাযালা বলেছেন-

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত:১৭)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَي الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

আর আমি তাকে (ইবরাহীম)ও লূতকে উদ্ধার করে সে দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৭১)

মুসলমানের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসা। পবিত্র কোরআনে মসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিনের কথা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। মসজিদুল আকসা ও তার আশপাশের অঞ্চলকে বরকতময় ভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে।

আল্লাহ বলেন,

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ

পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি নিজ বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা: বনি ইসরাঈল, আয়াত: ১)

ফিলিস্তিনের ইতিহাস

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার বাহক। এটাই সেই প্রথম ভূখণ্ড, যেখানে প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৯ হাজার বছর আগে মানুষ খেত-খামার ও স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেছিল। পরবর্তী ১ হাজার বছর পরে, খ্রিষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে গড়ে ওঠে 'আরিহা' নামক নগরী। আরিহা নগরীর পতনের পর থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও অসংখ্য নবী-রাসুল এই পবিত্র ভূমিতে বাসস্থান গড়ে তুলেছেন।

ফিলিস্তিনে কেনআনি সম্প্রদায় : যতগুলো সম্প্রদায় ফিলিস্তিনে বসবাস করেছে তাদের মধ্যে কেনআনি সম্প্রদায় সর্বাধিক পুরোনো। তাদের স্মৃতিচিহ্ন আজও ফিলিস্তিনে বিদ্যমান। কেনআনি সম্প্রদায় আনুমানিক ৪ হাজার ৫০০ বছর আগে আরব উপদ্বীপ থেকে এ অঞ্চলে আগমন করে। এ কারনে ফিলিস্তিনকে প্রাচীন ইতিহাসে 'আরদে কেনআন' বলা হয়।

ফিলিস্তিনে ইয়াবুসি সম্প্রদায় : আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত থেকে দেশত্যাগ করা গোত্রগুলোর মাঝে 'ইয়াবুসি' সম্প্রদায়ও ছিল। আল কুদস নগরী গড়ে ওঠার আগেই এই সম্প্রদায় এখানে বসবাস শুরু করেছিল। এ কারণে 'আল-কুদস' নগরীকে তাদের নামের দিকে সম্বন্ধিত করে 'ইয়াবুস' ও বলা হতো।

ফিলিস্তিনে ইবরাহিম (আ.) : হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর আগমন ফিলিস্তিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার মাধ্যমেই ফিলিস্তিনে তাওহিদের প্রদীপ নতুন করে প্রজ্বলিত হয়। কেন না, নুহ (আ.)-এর জমানায় প্লাবনে সব ধ্বংস হয়ে গেলে তিনিই সর্ব প্রথম তাওহিদের বাণী প্রচার শুরু করেন। তিনি ও তার স্ত্রী সারা (আ.) খ্রিষ্টপূর্ব উনিশ শতকে ইরাক থেকে ফিলিস্তিনে আগমন করেন এবং জেরুজালেমে একটি উপাসনালয় গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীতে 'বাইতুল মাকদিস'

নামে পরিচিতি লাভ করে। আর হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ছেলে ইসহাক (আ.) সহ তার বংশ পরম্পরা এ পবিত্র ভূমির পরিচর্যা করেন।

ফিলিস্তিনে বনি ইসরাইল : হজরত ইসহাক (আ.)-এর সন্তানের নাম ইয়াকুব (আ.)। তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে পরবর্তীতে তিনি তুরস্কে হিজরত করেন। কয়েক বছর পর আবারো তিনি ফিলিস্তিনে আগমন করেন। ইয়াকুব (আ.)-এর আরেক নাম ইসরাইল (আ.)। তার বংশধরকেই বনি ইসরাইল বলা হয়। ফিলিস্তিনে তখন হেকসোসদের শাসন চলছিল। এক সময় সম্রাট আহমোস ফিলিস্তিনে হামলা করলে হেকসোসরা পরাজিত হয়। আর সম্রাট আহমোস বনি ইসরাইলকে মনে করে হেকসোসদের সহযোগী। তাই তাদের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড জুলুমণ্ডনির্যাতন। এ অত্যাচার চলে প্রায় তিনশত বছর পর্যন্ত। আর বনি ইসরাইলের চরিত্রে নেমে আসে ব্যাপক ধস। তারা এক পর্যায়ে লিপ্ত হয় মূর্তিপূজায়। যে চরিত্রে বর্তমানে আমরা তাদের চিনি তারা এমন নয়। তারা ছিল মূলত উত্তম চরিত্রের অধিকারী একদল সম্প্রদায়।

ফিলিস্তিনে মুসা (আ.) : শত শত বছর অত্যাচারী বাদশাহগণ বনি ইসরাইলের ওপর নানান জুলুমণ্ডনির্যাতন চালায়। অবশেষে তারা অতিষ্ঠ হয়ে লোহিত সাগর অতিক্রম করে মিশরের সিনাই উপত্যকায় আসে। আর সেখানে ছিলেন হজরত মুসা ও হারুন (আ.)। ইসরাইলিরা মুসা ও হারুন (আ.) কে যারপরনাই কষ্ট দেয়। আল্লাহর নির্দেশে হজরত মুসা (আ.) খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে বনি ইসরাইলকে নিয়ে বাইতুল মাকদিসে রওয়ানা হন। তবে সেখানে অত্যাচারী কেনআনিদের বসবাস থাকায় বনি ইসরাইল শহরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় তারা তীহ প্রান্তরে পাগলের মতো ঘুরতে থাকে। তীহ প্রান্তরে থাকা অবস্থায়ই হজরত মুসা (আ.) ইন্তেকাল করেন।

ফিলিস্তিনে ইউশা (আ:) : হজরত মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পরে বনি ইসরাইলের নেতৃত্বের ভার আসে হজরত ইউশা (আ.)-এর ওপর। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী সালে বনি ইসরাইলদের নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তখন কেনআনিদের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যদ্ধু সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে বনি ইসরাইল বিজয় লাভ করে এবং ইউশা (আ.) তাদের নিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে। তার জীবদ্দশায়ই বনি ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। একসময় হজরত ইউশা (আ.) ইন্তেকাল করেন। আর তাদের মাঝে ছড়িয়ে পরে পৌত্তলিকতা। চরমে পৌঁছে তাদের অবাধ্যতা। তারা হারিয়ে ফেলে মুসা (আ.)-এর লাঠি।

ফিলিস্তিনে দাউদ (আ.) : খ্রিষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর শেষে শাওল ইবনে কায়স (তালুত) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তখন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যদ্ধু হয়। তাদের সেনাপতি ছিল জালুত। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হজরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেন। তালুতের ইন্তেকালের পরে দাউদ (আ.) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব দেন এবং ফিলিস্তিনে সবচেয়ে বড় ইহুদিবাদি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ঈমান ও আহলে ঈমানের আধিপত্য।

ফিলিস্তিনে সুলায়মান (আ.) : হজরত দাউদ (আ.) ফিলিস্তিনে ৪০ বছর শাসন করেন। তার ইন্তেকালের পরে হজরত সুলায়মান (আ.) বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বেশ দাপটের সাথেই শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তার প্রভাবে ইসরাইলিরা নুইয়ে পড়ে। তিনি জীনদের দ্বারা বাইতুল মাকদিসকে সংস্কার করেন। সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তেকালের পরে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র বিভক্ত হয়ে যায়। এক জনে নেতৃত্ব দেন ১০ গোত্রের আরেকজনে নেতৃত্ব দেন ২ গোত্রের। ১০ গোত্র ফিলিস্তিনের উত্তরে আর ২ গোত্র ফিলিস্তিনের দক্ষিণে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। বিশৃঙ্খলা ও একগুঁয়েমিতে ছিল উভয় গোত্রই বরাবর। মিশরের সম্রাট শিশাংক খ্রিষ্টপূর্ব ৯২০ সালে উত্তর অঞ্চলের ওপর হামলা করে দখল করে নেয়। আর ৭২১ সালে অ্যাসিরিয়ানরা (আশুরিয়া) দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর আক্রমন করে দখল করে নেয়। আর ধ্বংস হয়ে যায় ২০০ বছরের ইসরাইলি সাম্রাজ্য।

ফিলিস্তিনে বুখতে নসরের আক্রমণ : শিশাংক ও অ্যাসিরিয়ানদের আক্রমণে ইহুদি সম্প্রদায়ের কোমর ভেঙ্গে যায়। তবে ইহুদিদের ইয়াহুযা সম্প্রদায় ভাঙ্গা কোমর নিয়ে আরো ১৫০ বছর মাকদিস শাসন করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ইরাকের সেনাপতি বুখতে নসর আবারও তাদের ওপর তাণ্ডবলীলা চালায়। ধ্বংস করে মসজিদে আকসা। বন্দি হয় প্রায় ৪০ হাজার ইহুদি। আর চিরতরে অবসান ঘটে ইহুদিবাদি সাম্রাজ্যের। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের শাসনকাল ছিল মোট ৪১৮ বছর। যার মধ্যে সুলায়মান (আ.) ৮০ বছর ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করে। আর বাকি ৩৩৮ বছর ছিল ফিতনা -ফ্যাসাদ ও জুলুমণ্ডনির্যাতনে জর্জরিত। আর ইহুদিরা এ শাসনকেই বুনিয়াদ বানিয়ে এ দাবি তুলছে, যে তারাই ফিলিস্তিনের বেশি হকদার।

ফিলিস্তিনে ব্যাবিলন ও পারসিক শাসন : ইহুদি সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্য দিয়ে ব্যাবিলন শাসনের গোড়াপত্তন হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫৮৬ সাল থেকে ৫৩৯ সাল পর্যন্ত এ শাসন স্থায়ী হয়। পারসিকরা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইহুদিদের সহোযোগিতায় ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে। ব্যাবিলনদের ব্যাবেল শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে গোটা ফিলিস্তিনকে পারসিকরা দখলে নেয়। প্রায় ২০৭ বছর চলে তাদের শাসন কার্য।

ফিলিস্তিনে রোমান শাসন : রোমান সেনাপতি আলেকজেন্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে পারসিকদের পরাজিত করে। ইহুদিরা পারসিকদের থেকে ভালো সুবিধা না পাওয়ায় রোমানদের যুদ্ধে সার্বিক সহোযোগিতা করে। এমনকি কোনো কোনো ইহুদি রোমানীয়দের ধর্মও গ্রহণ করে। রোমানরা ফিলিস্তিন বিজয়ের পর সর্বপ্রথম তাকে রোমের অধীনে নিয়ে আসে। যা পরবর্তী সপ্ত শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাইজেন্টাইনের অধীনে ছিল।

ফিলিস্তিনে ঈসা (আ.) : ফিলিস্তিনে রোমানীয়দের শাসনকালেই ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিস্তিনিরা ৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা (আ.)-এর কুফুরীর অভিযোগ আনে। রোমান সম্রাট এ অভিযোগের

ভিত্তিতে তাকে শূলীতে চড়ায়।যা ইহুদি মতাদর্শে তাদের হাতে তার প্রাণ চলে যায়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। বরং আল্লাহ কুদরতিভাবে তাকে উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে গেছেন।

ইহুদিদের বিদ্রোহ ও রোমান শাসন : হজরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের প্রায় ১০০ বছর পর আবারও শুরু হয় ইহুদিদের বিদ্রোহ। ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বারবুখা-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের আক্রমণে ইহুদিরা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। আর হাদ্রিয়ানের সেনাবাহিনী দখলে নেয় আল কুদসের পুরো ইহুদি অঞ্চল। চালায় ধ্বংসের স্ট্রীমরোলার। এ ঘটনার পর থেকে ইহুদিরা আর কখনোই বিদ্রোহের চেষ্টা করেনি। তখন থেকে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আল-কুদস রোমানদের অধীনেই থাকে।

ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসন : ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ। চলছিল হজরত উমর (রা.) খেলাফত কাল। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে উড়ছিল মুসলিমদের বিজয় কেতন। মুসলিম বাহিনীর ইয়ারমুক বিজয়ের কারণে গাজা, নাবলুস, লদ, ইয়াফা ও রাফাহসহ কুদসের অন্যান্য অঞ্চলও বিজিত হয়। আল কুদসের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রোমান খ্রিষ্টানরা। দীর্ঘ ৪ মাস অবরোধের পর মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হন। তখন জেরুজালেমের বিশপ সফরোনিয়াস উমর (রা.) কাছে কুদসের চাবি প্রদানের শর্তারোপ করেন। অতঃপর উমর (রা.) নিজে ফিলিস্তিনে আগমন করেন এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নিম্ন লিখিত দু'টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন : এক. খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন গির্জাঘর ও উপাসনালয় নিরাপত্তা পাবে। দুই. এই পবিত্র শহরে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না। সেই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র 'আহদিয়ায়ে উমরিয়্যাহ' নামে বিখ্যাত।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) ছিলেন শামের প্রথম মুসলিম গভর্নর। তার ইন্তেকালের পর গভর্নর হন মুআয ইবনে জাবাল (রা.)। তার ইন্তেকালের পর গভর্নর হন ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)। তার ইন্তেকালের পর গভর্নর হন মুআবিয়া (রা.)। হজরত উসমান (রা.) খেলাফত কালে তিনিই পুরো শাম অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। আর উসমান (রা.) খেলাফতের শেষের দিকেই ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওসব ফিতনায় শাম ও ফিলিস্তিনের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ফিলিস্তিনে উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফত : হজরত মুআবিয়া (রা.) হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয় উমাইয়া খেলাফত। ৪১-১৩২হি:/৬৬০-৭৫০খ্রি. পর্যন্ত চলে তাদের শাসনকাল। সেই সময়টা ছিল ফিলিস্তিনিদের উন্নতি ও অগ্রগতির বসন্ত কাল। ১২৯ হি: ভূমিকম্পে মসজিদে আকসার বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন উমাইয়া খলিফার নেতৃত্বে দ্রুত মসজিদটির মেরামত করা হয়। ১৩২ হি: উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসী খেলাফত। ১৩২-৬৬৫ হি: পর্যন্ত চলে তাদের শাসন। আব্বাসী যুগে আল আকসার ঐতিহ্যের কার্যক্রম বেগবান হয়। খলিফা

হারুনুর রশিদ ও তার ছেলে মাহদী এই মসজিদ পরিদর্শনে আসে। সেখানকার জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।

ফিলিস্তিনে শিয়া শাসন : ১৩২-৬৫৬ হি: পর্যন্ত আব্বাসী শাসন থাকলেও তারা ২৪৭ হি: দুর্বল হয়ে পড়েন। আব্বাসীয়দের দুর্বলতাকে কাজে লাগায় উবায়দিয়রা। তারা ছিল নিকৃষ্ট শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। উবায়দিয়াদের দখলের মধ্য দিয়ে এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে ফিলিস্তিন। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াতের কার্যক্রম একেবারে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে। তবে ৪৬৩ হি: সুলতান আল্প আরসালানের নির্দেশে তুর্কি সেনাপতি আতসিয ইবনে উবাক উবায়দিয়াদের হাত থেকে ফিলিস্তিনিদের উদ্ধার করে। কিন্তু সামান্য ভুলের কারণে ৪৮৯ হি: উবায়দিয়ারা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ফিলিস্তিন দখল করে।

ফিলিস্তিনে ক্রুসেডার শাসন : ৪৯০ হিজরিতে উবায়দিয়াদের শাসন আমলে ধেয়ে আসে ক্রুসেডাররা। দ্বিতীয় পোপ আরবান ক্রুসেডরদের উদ্দেশে এক জালাময়ী বক্তৃতা দেয়। যা সমগ্র ইউরোপে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আবেগী কণ্ঠে বলে 'মহামতি মসিহের সমাধি মুসলমানদের থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাদের হাত থেকে আল কুদসকে পবিত্র করতে হবে'। যার ফলে পিটার আন নাসিক এর নেতৃত্বে ক্রুসেডররা ফিলিস্তিনে হামলা করে এবং তারা ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কুদস আঙ্গিনায় প্রবেশ করে ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে কুদস শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ক্রুসেডারদের শাসনামলে বাইতুল মাকদিস ছিল ল্যাটিন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে। ক্রুসেডাররা ৫৬৫(হি.) পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত বছর ফিলিস্তিন শাসন করে।

ফিলিস্তিনে সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর (র.) শাসন : মহাবীর সালাহ উদদ্দিন আইয়ুবীর সঙ্গে ৫৮৩ হিজরিতে ক্রুসেডারদের এক রক্তক্ষয়ী যদ্ধু সংঘটিত হয়। যা ইতিহাসে হিত্তিনের যদ্ধু নামে পরিচিত। মুসলমানগণ এ যুদ্ধে বিজয়ী হলে কুদস দখলের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সালাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যদল ৫৮৩ হিজরির ১৫ রজব থেকে টানা ১২ দিন বাইতুল মাকদিস অবরোধ করেন। অবরোধ শেষে ২৭ রজব আল কুদসের ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রুসেডররা আল মসজিদুল আকসাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে। এক ভাগ বানানো হয় গির্জাঘর। দ্বিতীয় ভাগকে বানানো হয় সৈন্যদের কোয়াটার। তৃতীয় ভাগকে বানানো হয় স্টোর রুম। আরেক ভাগকে পরিণত করা হয় ঘোড়ার আস্তাবল। সালহ উদদ্দিনের সৈন্যদল ভেতরে প্রবেশ করে এবং আল আকসা মসজিদ এক সপ্তাহ ধরে পরিষ্কার করে। অতঃপর তারা সবাই আল মাসজিদুল আকসায় শুকরিয়ার নামাজ আদায় করেন। ৫৮৩ হিজরি থেকে নিয়ে ১৩৩৫ হিজরি পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসে চলে মুসলমানদের সোনালি যুগ। উসমানীয় সাম্রাজ্য চলাকালে মোনাফেক মুসলমান ও ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে বাইতুল মাকদিসের পতনের যাত্রা শুরুহয়। আর সেই ধারাবাহিতায় ইহুদিরা ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে প্রায় সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড।

ফিলিস্তিনের পতনের সূচনা : ফিলিস্তিন ভূমধ্যসাগরের পূর্বে ১০ হাজার ৪২৯ বর্গমাইলব্যাপী লু-হাওয়ার তপ্ত মরুভূমির দেশ। মুসলমানদের প্রথম কিবলা ও অসংখ্য নবী রাসুলের পায়ের ধূলোয় ধূসরিত এক পুণ্যভূমি। আরবীয় সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা এ দেশটি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত উসমানীয় খেলাফতের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে দেশটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ইহুদিবাদী ইজরাইল রাষ্ট্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ফিলিস্তিন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফিলিস্তিন ব্রিটেনবিরোধী জোটে ছিল? ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হলে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার চুক্তিতে যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা কামনা করে? যা ইতিহাসে 'বেলফোর ঘোষণা' হিসেবে পরিচিত? আর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশি তাই স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা মুসলমানদের অনুকূল বলেই ধরে নেয় স্থানীয় আরবীয়রা। তবে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইহুদি বিজ্ঞানী ড. হেইস বাইজম্যান বোমার কৃত্রিম ফসফরাস তৈরি করে ব্রিটেনকে উপহার দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আনন্দিত হয়ে এই ইহুদি বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চাইলেন কী ধরনের পুরস্কার তিনি চান? সে উত্তর দিয়েছিল- অর্থ বা সম্পদ নয়! আমার স্বজাতির জন্য এক টুকরো ভূমি চাই, আর তা হবে 'ফিলিস্তিন'? অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন বিজয়ী হওয়ার পর ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর দেশটিকে নিজেদের শোষণের অধীনে রাখে? যা ছিল ফিলিস্তিনকে আরব বিশেষত মুসলিম শূন্য করার এক অভিনব প্রক্রিয়া।

মুসলমানদের উচ্ছেদকরণ : ১৯২০ সাল। বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশবিরোধী শক্তিগুলো পরাভূত। অপর দিকে ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার আশায় ক্ষণ গুনে গুনে তদবির চালাচ্ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা মুসলমানদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে 'জাতিপুঞ্জ' ঘোষণার মাধ্যমে ম্যান্ডেটরি প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে বিভিন্নদেশে বসবাসরত ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিন আসতে শুরু করে এবং ইহুদিবাদী তিনটি প্রধান সংগঠন হাগানাহ, ইরগুন ও স্ট্যার্ন গ্যাং ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় মুসলিম নারী-পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও বাড়িতে বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। যাতে করে আরবীয়রা ফিলিস্তিন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। সংগঠনগুলোর গণহত্যার কথা যখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে ফিলিস্তিনি বন্দরে ভিড়তে চাওয়া দু'টি জাহাজকে হাইফা বন্দরে তারা ধ্বংস করে এবং জাহাজে থাকা ১০৪৫ জন ইহুদিকে হত্যা করে বিশ্ব জনমতকে ব্রিটিশদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে? অন্যত্র ধীরে ধীরে আরবদের উচ্ছেদকরণও চলতে থাকে? যার ফলে ২০ লাখ জনগণের মধ্যে ইহুদিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৪০ হাজার? সর্বশেষ ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর মার্কিনিদের চাপে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড নিয়ে জাতিসংঘে ভোটগ্রহণ করা হয়, তাতে ৩৩টি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে, ১৩টি বিপক্ষে এবং ১০টি দেশ ভোট প্রদানে বিরত থাকে। অতঃপর

ইহুদিরা ভূমির ৫৭ শতাংশ আর আরবীয়রা ভূমির ৪৩ শতাংশ জায়গায় নতুন বসতি স্থাপন করে। তবে ইহুদি রাষ্ট্রটির উত্তর-পশ্চিম সীমানা ছিল অনির্ধারিত। আর এ সুযোগে ইহুদিরা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে থাকে।

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : জাতিসংঘের রায়ের পর আরবীয়রা গাজা নামক শহরের উপকণ্ঠ উত্তর-দক্ষিণে বসবাস শুরু করে। আর ইহুদিরা ফিলিস্তিনের উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতে শুরু করে। যেহেতু উত্তর-পশ্চিমের তাদের বসবাসের সীমানা নির্ধারিত ছিল না, তাই তারা মুসলমানদের সেখান থেকে সমূলে বিতাড়িত করে ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতি করত। কখনো কখনো পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে রাখত। যার ফলে অসংখ্য আরবীয়রা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ লেবানন ও মিশরে পাড়ি জমিয়েছিল। আর ইজরাইল বাহিনী এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের সীমানা বাড়িয়েই চলছিল। কিছুদিন পরেই ইহুদি জায়নবাদীদের প্রধান দাভিদ বেন গুরিয়নকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে ১৯৪৮ সালের ১২ মে রাত ১২টা এক মিনিটে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। ওই রাতের ১২:১০ মিনিটেই যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশ ধাপে ধাপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে।আর তখন থেকেই শুরু হয় ইহুদিদের তাণ্ডবলীলা।

ফিলিস্তিনে হামাস : মিশরের ইসলামি রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুড। দখলদার ইসরাইলিদের কাছে বাস্তুচ্যুত অনেক ফিলিস্তিনি মিশরে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাদারহুডের আদর্শে দীক্ষা নেন। ১৯৮৭ সালে এমনই দুজন আহমেদ ইয়াসিন ও আব্দেল আজিজ আল-রানতিসি প্রতিষ্ঠা করেন হামাস। হামাস হচ্ছে, হারকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া- এর সংক্ষেপ, যার অর্থ ইসলামি নবজাগরণের আন্দোলন। হামাসের দু'টি সংগঠন রয়েছে। এর একটি সাংস্কৃতিক, যার নাম দাওয়াহ। আর অপর সামরিক শাখার নাম ইজ্জ আদদ্বীন আল-কাসসাম ব্রিগেডস।

হামাসের আন্দোলন : ১৪-১২-১৯৮৭ সালে হামাসের আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় যা আজও চলমান। তারা মুক্তিকামী যোদ্ধা। স্বাধীনতাযুদ্ধে মরণজয়ী হয়ে ইসরাইলের জুলুমের প্রতিবাদ করে চলেছে নিরন্তর। আল্লাহর এই মুজাহিদ বাহীনির দ্বারাই হয়ত আল্লাহ বাইতুল মাকদিসকে আবারও মুসলমানদের হস্তগত করবেন- ইনশাআল্লাহ।

সূত্র : ১. বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস ২. মসজিদে আকসা কোটি মুমিনের হৃদয়ের স্পন্দ ৩. আলকাউসার রবিউল আখির ১৪৪৫হি./নভেম্বর ২০২৩ইংরেজি।

ফিলিস্তিনে নবীদের স্মৃতি

ফিলিস্তিন অসংখ্য নবী রাসুলের পূণ্যভূমি। হিজরতের ভূমি। মহান আল্লাহর বরকতের ভূমি। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ ভূমিতে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসুল।মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর পর সবচেয়ে দামি মসজিদ মসজিদুল আকসা এ ভুমিতেই অবস্থিত। ফিলিস্তিনের বুকে যতজন নবী-রাসুল ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভূমি সেটা পারেনি। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আ. থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত প্রায় সব নবী এ ভূমিতেই এসেছিলেন। তুলে ধরছি সেসব নবী-রাসুলদের নিয়ে, যারা ধন্য করেছিলো ফিলিস্তিন ভূমি।

ফিলিস্তিনে হযরত ইবরাহিম আ. -এর হিজরত:

হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) ইরাকের বাবেল শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হন তিনি। এক আল্লাহর ইবাদতের অপরাধে তার বাবা তাকে দেশান্তরিত করার হুমকি দেয়।

ঈমান রক্ষায় স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লুতসহ প্রথমে হাররান, সেখান থেকে হালবে তারপর ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করেন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)।

ফিলিস্তিনেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জেরুজালেমেই তাকে সমাহিত করা হয়।

ফিলিস্তিন ইসমাঈল আ.-এর জন্মস্থান:

বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরতের পর দীর্ঘ ২০ বছর নিঃসন্তান থাকেন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)। বিবি সারা ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, আল্লাহ আমাকে সন্তান দেননি। আপনি আমার দাসী হাজেরাকে বিয়ে করেন। হতে পারে আল্লাহ তার থেকে সন্তান দান করবেন। হাজেরার গর্ভে ফিলিস্তিনে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাঈলসহ হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসেন।

ইসহাক আ.-এর জন্মভূমি ফিলিস্তিন:

হযরত ইবরাহিম আ.-এর দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক (আলাইহিস সালাম)। স্ত্রী সারার গর্ভ থেকে ইসহাক (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের সুসংবাদ এমন সময় পেয়েছেন, যখন উভয়ে শেষ বয়সে উপনীত হন। যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ وَهَبَ لِیۡ عَلَی الۡکِبَرِ اِسۡمٰعِیۡلَ وَاِسۡحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ لَسَمِیۡعُ الدُّعَآءِ ٣٩

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার বার্ধক্য অবস্থায় আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন, আমার প্রতিপালক অবশ্যই আহবান শ্রবণকারী। (সূরা ইবরাহীম :৩৯)

ইসহাক (আলাইহিস সালাম) ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গে সেখানেই বসবাস করেন। তিনি ফিলিস্তিনেই ইন্তেকাল করেন।সেখানেই কবরস্থ হন।

ফিলিস্তিনে আল্লাহর নবী লুত আ.-এর বসবাস:

হযরত লুত (আলাইহিস সালাম) এর বসবাস ছিলো বৃহত্তর ফিলিস্তিনে। তিনি ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তার সঙ্গে ফিলিস্তিনে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর পরামর্শে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা সাদুম ও আমুরায় চলে যান। ঐহিতাসিকদের বর্ণনা মতে যা বর্তমান মৃত সাগর ও তার তীরবর্তী এলাকা। সেখানকার লোকেরা নিকৃষ্ট ও ঘূর্ণিত স্বভাবের ছিলো। তারা সমকামিতায় আসক্ত ছিলো। লুত (আলাইহিস সালাম) তাদের ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বললেন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন,

سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ٨٠اِنَّكُمْ لَـتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْـتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ
٨١

'আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে নিজ জাতিকে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সারাবিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো কামবশত নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করো। বরং তোমরা সীমালজ্ঘন করছো।' (সুরা আরাফ, আয়াত নম্বর ৮০, ৮১)

এ ঘৃণিত অপরাধের কারণে সাদুম ও আমুরাবাসীর ওপর আসমানি গজব নেমে আসে। আল্লাহর হুকুমে লুত আ. পাশ্ববর্তী পাহাড়ে চলে যান। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন।

ইয়াকুব আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন:

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) ইসহাক (আলাইহিস সালাম) ছেলে। ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এর নাতি। জন্ম ফিলিস্তিনে। ভাই ইসুর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, মা রাফকার পরামর্শে তিনি দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে চলে যান। সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থানের পর স্ত্রী-সন্তানসহ ফিলিস্তিনে চলে আসেন (

ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর বারো জন ছেলে ছিল।

শেষ বয়সে মিশরে হিজরত করেছিলেন তিনি। সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। মিশরেই তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি সন্তানদের ওয়াসিয়ত করেছিলেন, মিশর ত্যাগকালে তার লাশ যেন ফিলিস্তিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়াসিয়ত অনুযায়ী তার লাশ ফিলিস্তিনে নিয়ে আসা হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি বাইতুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয়।

ইউসুফ আ.-এর শৈশব কাটে ফিলিস্তিনে:

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)। তিনি হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) -এর ছেলে। দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এরপরই পিতা ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে ফিলিস্তিনে চলে আসেন। শৈশবের কিছুদিন ফিলিস্তিনেই কাটে তার। ছোটবেলায় তিনি ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। পরে নবুয়াত লাভ করার পর মিশরের মন্ত্রী হন।

নবুয়াত লাভের আগে তিনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে তালুতের দলে যুদ্ধে শরিক হন। অত্যাচারী বাদশাহ জালুতকে তিনি হত্যা করেন। আসদুদ, বাইতে দুজান, আবু গাওস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও রামলার শাসক ছিলেন তিনি। ফিলিস্তিনেই ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রামলাগামী পথের ডানপার্শ্বে একটি পাহাড়ে তাকে সমাহিত করা হয়।

হযরত সুলাইমান আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন:

হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) -এর ছেলে। আল্লাহর নবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোটা পৃথিবী শাসনকারী শাসকদের অন্যতম।আল্লাহ তাআলা পশু-পাখি, বায়ুমণ্ডল ও জিন জাতিকে তার অধীন করে দিয়েছিলেন। এই মহান নবীর জন্ম, বসবাস সবই ছিলো ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক। তিনি ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের নির্মাতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৯২৩ সালে ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে তাকে দাফন করা হয়।

ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মস্থান ফিলিস্তিন:

আল্লাহর আরেক নবী হযরত ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) -এর জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে। হযরত জাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ায় আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সে দান করেন ছেলে ইয়াহইয়া আ.-কে। তার মর্যাদা, তাকওয়া, জনপ্রিয়তা ও আল্লাহর দিকে আহ্বান-এর কারণে তিনি ইহুদিদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। যার কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে তাকে শহিদ করা হয়।

কেয়ামতের আগে ঈসা আ. ফিলিস্তিনেই নেমে আসবেন:

ঈসা ইবনে মারইয়ামের জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল লাহামে। যিনি পিতা ব্যতীত আল্লাহর কুদরতের সাক্ষী হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। তিনি ফিলিস্তিন অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন। মায়ের সঙ্গে মিশরেও গমন করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে আবার ফিলিস্তিনে চলে আসেন। অভিশপ্ত ইহুদিরা তাকে জারজ সন্তান ও তার মাকে দুশ্চরিত্রা বলে অপবাদ দেয়। তিনি তাদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করেন। আল্লাহর গজব নেমে আসে ইহুদিদের উপর।

তখন তারা ঈসা আ. কে হত্যার পরিকল্পনা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ কুদরতে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। কিয়ামতের আগে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে নেমে আসবেন। দাজ্জাল কে হত্যা করবেন। ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপর তার মৃত্যু হলে নবীজির রওজার পাশে সমাহিত হবেন ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং মহান আল্লাহ ফিলিস্তিনের ভূমিকে কতটা বরকতময় করেছেন তা নবী র ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমেয়।

বায়তুল মুকাদ্দাসের সূচনা

বাইতুল মুকাদ্দাস বা মসজিদে আকসা। এটি মুসলমানদের প্রথম কেবলা। ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত এ মসজিদে মেরাজের রাতে রাসূল (সা.) সব নবী-রাসূলের ইমামতি করেন। হাদিস শরিফে রয়েছে, 'কাবা শরিফ তথা মসজিদুল হারামে নামাজে এক লাখ গুণ সওয়াব, মদিনা শরিফে মসজিদে নববীতে নামাজে ৫০ হাজার গুণ সওয়াব, বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজে ২৫ হাজার গুণ সওয়াব' (ইবনে মাজাহ)। ফিলিস্তিনের ভূমি অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত, এর আশপাশে অনেক নবী-রাসূলের সমাধি রয়েছে। এটি দীর্ঘকালের ওহি অবতরণস্থল, ইসলামের কেন্দ্র এবং ইসলামি সংস্কৃতির চারণভূমি। মুসলমানদের পবিত্র এ ভূমি ভাঙা-গড়ার সর্বশেষ পর্বে এখন ইহুদিদের দখলদারির করাল গ্রাসে আক্রান্ত।মসজিদে আকসা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থাপনা। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বর্ণনা করেন,

'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যকোনো মসজিদে বিশেষ সওয়াবের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করো না। আর সে তিনটি মসজিদ হলো— মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদুল আকসা।' (সহিহ বুখারি: ১১১৫)

পবিত্র কাবাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর নির্মিত হয় আল আকসা। তাই এটিই মক্কার পর পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম নগরী। বর্তমান পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠান একে ওল্ড সিটি ঘোষণার অনেক আগেই নবীজি (স.) একে ওল্ড সিটি বা প্রাচীনতম শহরের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। হজরত আবুজর গিফারি (রা.) বলেন, 'আমি নবীজি (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম—

'হে আল্লাহর রাসুল (স.)! দুনিয়াতে কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর হলো মসজিদুল আকসা। অতঃপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের। (সহিহ বুখারি: ৩১১৫)

আল-আকসা মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হজরত আদম (আ.), হজরত ইয়াকুব (আ.), হজরত সুলায়মান (আ.) এর নাম। জড়িয়ে আছে প্রায় অর্ধ জাহানের মুসলিম শাসক হজরত ওমর (রা) এবং এরপর দ্যা গ্রেট সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীসহ অসংখ্য বীরের নাম। উল্লেখিত কেউ ইহুদিদের পূর্বপুরুষ ছিলেন না। এমনকি হজরত সুলায়মান (আ.)ও ইহুদিদের সরাসরি নবী ছিলেন না। তাই 'জেরুজালেম তাওরাত কিংবা ইহুদিদের ভূমি' সংক্রান্ত ইসরাইলি দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন। বরং মুসলমানরাই সুলায়মান (আ.)-এর যথার্থ উত্তরাধিকারী। কেননা ইসলাম সকল নবীর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া হজরত মুসা (আ.)-এর উপর তুর পাহাড়ে

তাওরাত নাজিল হলেও তিনি ফিলিস্তিনে বাস করেননি এবং ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তা সম্ভবও হয়নি। এছাড়াও মহানবী (স.) বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মেরাজে গমন করার কারণে তা চূড়ান্তভাবে ইসলামেরই পবিত্র স্থান ও পুণ্যভূমি।

নির্মাণের ইতিহাস

হজরত ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক কাবাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর হজরত ইয়াকুব (আ.) আল-আকসা মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর হজরত সুলায়মান (আ.) জ্বিনদের মাধ্যমে এই পবিত্র মসজিদের পুনর্নির্মাণ করেন। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পুরো বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকা মুসলমানদের অধীনে আসে।

১০৯৯ সালের **১৫** জুলাই খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা নামধারী মুসলিম শাসকদের সহায়তায় সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন দখল করে। এরপর তারা **১০৯৯** সালের ৭ জুন বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে এবং **১৫** জুলাই মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে ব্যাপক পরিবর্তন করে একে গির্জায় পরিণত করে।

১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। ফাতেমি খিলাফতের কেন্দ্রীয় খলিফার নির্দেশে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি (রহ) গভর্নর ও সেনাপ্রধান হয়ে মিসরে আগমন করেন। এরপর **১১৮৭** সালের ২০ সেপ্টেম্বর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এই মুসলিম বীর জেরুজালেম শহর মুসলমানদের অধিকারে নিয়ে আসেন।

অতঃপর **১১৮৭** সালের ২ অক্টোবর শুক্রবার সালাহউদ্দিন আইয়ুবি (রহ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন।

সংস্কারের ইতিহাস

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের যুগে মসজিদটি পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়। এই সংস্কার ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদের শাসনামলে শেষ হয়। ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পরে তার উত্তরসুরি আল মাহদি এর পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরেকটি ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফাতেমীয় খলিফা আলি জাহির পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করেন যা বর্তমান অবধি টিকে রয়েছে।

বিভিন্ন শাসকের সময় মসজিদটিতে অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গম্বুজ, আঙ্গিনা, মিম্বর, মিহরাব, অভ্যন্তরীণ কাঠামো। বর্তমানে জেরুজালেম দখলদার ইসরায়েলিদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মসজিদটি রয়েছে জর্ডানি/ফিলিস্তিনি নেতৃত্বাধীন ইসলামি ওয়াকফের তত্ত্বাবধানে।

আল-আকসার সঙ্গে অন্যান্য স্থাপনার পরিচয়

মসজিদে আকসার সঙ্গে অবস্থিত স্থাপনাগুলোও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন কুব্বাতুস সাখরা, কুব্বাতুস সিলসিলা ও কুব্বাতুন নবী। কুব্বাতুস সাখরাকে অনেকেই ভুলবশত মাসজিদুল আকসা মনে করে থাকেন। এটি আল আকসা মসজিদ কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি গম্বুজ। এ গম্বুজটির নিচে রয়েছে 'সাখরা' নামক একটি পাথর। কুব্বাতুস সাখরা উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আদেশে ৬৮৯ থেকে ৬৯১ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়।

জানা যায়, ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে নেওয়ার পর কুব্বাতুস সাখরা অগাস্টিনিয়ানদের দিয়ে দেওয়া হয়। তারা এটিকে গির্জায় রূপান্তর করে এবং আল-আকসা মসজিদকে রাজকীয় প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। নাইটস টেম্পলাররা কুব্বাতুস সাখরার স্থানটিকে সুলায়মান (আ.) নির্মিত স্থাপনা বলে বিশ্বাস করত। তবে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, মাসজিদুল আকসার ইবাদতের স্থানটিই নবী সুলায়মান (আ.) তৈরি করেছিলেন যা সময়ের ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

কুব্বাতুস সাখরার পূর্ব পাশে অবস্থিত একটি গম্বুজের নাম কুব্বাতুস সিলসিলা। এটি হারাম আশ শরিফের অন্যতম প্রাচীন স্থাপনা। এটিও মসজিদ নয়। তবে এটিকে মুসল্লা বা সালাতের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উমাইয়া শাসনামলে এটি নির্মাণ করা হয়। ক্রুসেডারদের সময় এটি একটি খ্রিষ্টান চ্যাপল হিসেবে ব্যবহার করা হত। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি (রহ) পুনরায় এটিকে সালাতের স্থানে রূপান্তর করেন। পরবর্তীতে মামলুক, উসমানীয় ও ফিলিস্তিন ভিত্তিক ওয়াকফ এই স্থাপনার সংস্কার করে।

কুব্বাতুন নবী হারাম আশ শরিফে অবস্থিত একটি গম্বুজ। এটি উসমানীয় আমলে নির্মিত হয়। ১৫৩৮ সালে জেরুজালেমের উসমানীয় গভর্নর মুহাম্মদ বে এই গম্বুজ নির্মাণ করেন। ১৬২০ সালে তৎকালীন গভর্নর ফারুক বে তা পুনরায় সংস্কার করেন। কুব্বাতুন নবী স্থাপনাটি অষ্টভুজাকার এবং এর আটটি স্তম্ভ ধূসর মার্বেলে নির্মিত। এটি প্রিয়নবী (স.)-এর স্মরণে নির্মিত হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ)সহ বেশকিছু গবেষকদের মতে, এই স্থানে প্রিয়নবী (স.) অন্যান্য নবী ও ফেরেশতাদের নিয়ে মেরাজের রাতে সালাত আদায় করেছিলেন।

ইবনে তাহমিয়ার মতে, সুলায়মান (আ.)-এর তৈরি স্থাপনার সম্পূর্ণ স্থানটির নামই হল আল মসজিদুল আকসা। এই মসজিদ নির্মাণের পর থেকে ঈসা (আ.)-সহ অনেক নবীর দ্বারা আল্লাহর ইবাদতের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। হিজরতের পর বায়তুল্লাহ নতুন কিবলা হয়।

নবী-রাসুলদের স্মৃতি বিজড়িত

ঐতিহাসিক এ স্থানের সঙ্গে জড়িয়ে মুসলমানদের নানা স্মৃতি। এখানেই শুয়ে আছেন হজরত ইবরাহিম ও মুসা (আ.)-সহ অসংখ্য নবী-রাসুল। এখানেই মহানবী (স.) সব নবী-রাসুল এবং ফেরেশতাদের নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। সেই জামাতের ইমাম ছিলেন স্বয়ং নবীজি (স.)। এখান

থেকেই তিনি বোরাকে করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্ব-যাত্রা করছিলেন। পবিত্র কোরআনের প্রায় ৭০ জায়গায় উচ্চারিত হয়েছে এ মসজিদের কথা। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিককে আমি বরকতময় করেছি, যেন তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই।' (সুরা বনি ইসরাইল: ১)

মসজিদে আকসায় নামাজের ফজিলত

হজরত সুলায়মান (আ.) যখন এই মসজিদ নির্মাণ শেষ করেছিলেন, তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাজের উদ্দেশ্যেই ওই মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ওই দিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (নাসায়ি: ৬৬৯, ইবনে মাজাহ: ১৪০৮)

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাহ (রা.) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদে হারামে হজ কিংবা ওমরা পালনে গমন করবে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিংবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।' (সুনানে আবু দাউদ: ১৪৭৯)

মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল (স.)-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে কিছু বলুন!' রাসুল (স.) বললেন, 'বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে সালাত আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সওয়ার পাওয়া যায়..।" (মুসনাদে আহমদ: ২৬৩৪৩)

মুসলমানদের কাছে আল আকসার গুরুত্ব

আল আকসার কতটা বরকতময় এবং আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বারংবার বলেছেন। এই আকসার কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে তা আমাদের স্পষ্টভাবে জানা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আল আকসার গুরুত্ববালী তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ।

এক. দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ

মসজিদে আকসার একটি বড় পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হল, এটি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রাচীন মসজিদ। মসজিদে হারামের পরেই এই মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصى. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً...

আবু যর রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ স্থাপিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্ মসজিদ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। বললাম, এই দুইয়ের নির্মাণের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২০

দুই. বরকতময় মসজিদ, বরকতপূর্ণ ভূমি

মসজিদে আকসার একটি বিশেষ ফযীলত হল, আল্লাহ একে বরকতময় করেছেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আশপাশের জনপদকেও বরকতপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ.

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা, সব কিছুর জ্ঞাতা। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন—

وَجَعَلۡنَا بَیۡنَہُمۡ وَبَیۡنَ الۡقُرَی الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡہَا قُرًی ظَاہِرَۃً...

আমি ওদের এবং যে জনপদগুলোতে বরকত রেখেছি, তার মাঝে এমন সব জনপদ স্থাপন করেছিলাম, যা নজরে আসত...। —সূরা সাবা (৩৪) : ১৮

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে বরকতময় জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাইতুল মাকদিসের জনপদ। —তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৬, পৃ. ৪৬৮

তিন. তৃতীয় মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মসজিদে হারাম, যা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। দ্বিতীয় মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মসজিদে নববী, যা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত। এই দুই মসজিদের পরেই তৃতীয় পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠতম মসজিদ হল মসজিদে আকসা, যা ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

সফর করলে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, এবং মসজিদে আকসা। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৭

এই হাদীস প্রমাণ করে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীর পরেই মর্যাদার দিক থেকে মসজিদে আকসার অবস্থান।

চার. মুসলিমদের একসময়ের কেবলা

মসজিদে আকসার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলিম উম্মাহর একসময়ের কেবলা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কা'বাকে সামনে রেখে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পরও ষোলো মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরেই নামায আদায় করেছেন। অতঃপর কেবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৯৯১; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১১০৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৯৬৭

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম মদীনায় এলেন, তাঁর মামাদের বাড়িতে মেহমান হলেন। আর তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে ১৬ থেকে ১৭ মাস পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন। তবে তিনি চাইতেন বাইতুল্লাহ যেন তাঁর কেবলা হয়...। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৫

পাঁচ. ইসরা ও মেরাজের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ

মসজিদে আকসার গুরুত্ব বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মেরাজ রজনীতে আমাদের নবীজী ঊর্ধ্বজগতের সফর শুরু করার পূর্বে জিবরীল আমীনের সাথে প্রথমে এই মসজিদে এসেছেন এবং নামায আদায় করেছেন। তিনি ইমামতি করেছেন আর সমস্ত নবীগণ তাঁর ইকতিদা করেছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাইতুল মাকদিসের বিবরণ দিতে গিয়ে) বলেন—

وقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّه مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِه شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِه صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَه- فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ...

আর আমি নিজেকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের জামাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। দেখি, হযরত মূসা আ. নামাযরত আছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁর চুল কোঁকড়ানো, যা ছিল কান পর্যন্ত ঝুলন্ত। দেখে মনে হবে, যেন 'শানওয়া' গোত্রেরই একজন লোক। হযরত ঈসা আ.-কেও নামাযে দণ্ডায়মান দেখা গেল। তাঁর আকার আকৃতি সাহাবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রা.-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ইবরাহীম আ.-কেও নামাযরত

অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হল। নবীজী বলেন, তাঁর দেহাবয়বের সাথে আমার দেহাবয়বের মিল বেশি। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল আর আমি তাঁদের সকলের ইমামতি করলাম। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২

একটি দীর্ঘ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتى أَمَمْتُهُمْ.

অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করলাম। সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করা হল। জিবরীল আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন আর আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। —সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৪৯

ছয়. হাশরের ময়দান

বাইতুল মাকদিসের গুরুত্ব এখান থেকেও বোঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন এটাই হবে হাশরের ময়দান। হযরত মাইমুনা রা. বলেন—

يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: هُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَأَرْضُ الْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ...

হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এটা হবে হাশরের ময়দান। এখান থেকে মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাবে। তোমরা এখানে আসো এবং নামায আদায় করো...। —মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮

নুরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন—

رجاله ثقات.

এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫

সাত. যিয়ারতকারীর জন্য বিশেষ দুআ

মসজিদে আকসার একটি বড় ফযীলত হল, হযরত সুলাইমান আ. এই মসজিদ যিয়ারতকারীর জন্য একটি বিশেষ দুআ করেছিলেন। আর স্বয়ং আমাদের নবী এই দুআ কবুল হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَه، وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه، وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ، إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّه.

সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. যখন বাইতুল মাকদিস নির্মাণ থেকে ফারেগ হলেন, আল্লাহর কাছে তিনটি দুআ করলেন—

১. তাঁর প্রতিটি ফায়সালা যেন আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক হয়।

২. তাকে যেন এত বড় রাজত্ব দেওয়া হয়, যা তাঁর পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না।

৩. একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই মসজিদে আগমন করবে, আল্লাহ্ যেন তাকে সেদিনের মতো নিষ্পাপ করে দেন, যেদিন তার মা তাকে জন্মদান করেছেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় দুআ তো আল্লাহ কবুল করেছেন। আর আমি আশাবাদী আল্লাহ তাঁর তৃতীয় দুআও কবুল করেছেন। —সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৬৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪০৮

আট. মসজিদে আকসায় নামাযের সওয়াব

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীর পাশাপাশি মসজিদে আকসায় নামায পড়ার সওয়াবও অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি।

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.

মসজিদে হারামের নামায এক লক্ষ নামাযের সমতুল্য। আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায এক হাজার নামাযের সমতুল্য। আর বাইতুল মাকদিসের নামায পাঁচ শ নামাযের সমতুল্য। —মুসনাদে বাযযার (কাশফুল আসতার), হাদীস ৪২২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩৮৪৫

নূরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন—

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وفي بعضه كلام وهو حديث حسن.

—মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫

নয়. মসজিদে আকসার খেদমতে অংশগ্রহণ

যদি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করা বা মসজিদে আকসায় নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোনোভাবে এই মসজিদের খেদমতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাইমুনা রা. বলেন—

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتًا كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ.

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করতে সক্ষম না হবে, সে কী করবে?

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এখানে আসার সামর্থ্য রাখবে না, সে যেন এখানের বাতি জ্বালানোর জন্য তেল হাদিয়া পাঠায়। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তেল হাদিয়া পাঠাবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে, যে সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করেছে। —মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৬২৬

নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন—

رجاله ثقات.

—মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫

১৭ হিজরীতে যখন বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে এল তখন উমর রা. এই মসজিদে নামায পড়েছেন এবং নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়েছেন। (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬১)

ইবনে কাসীর রাহ. এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলেছেন। —মুসনাদে ওমর ১/১৬০

দশ. মসজিদে আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করা

এক পবিত্র ভূখণ্ড থেকে আরেক পবিত্র ভূখণ্ডে সফর করা কতইনা আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। একারণেই হাদীস শরীফে মসজিদে আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হযরত উম্মে সালামাহ রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ .

যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ্ করবে, তার গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। —সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০০১

ইমাম মুনযীরী রাহ. বলেন—

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

(আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/১৮৮)

এগারো. বাইতুল মাকদিসের সান্নিধ্যে বসবাস

পবিত্র ভূখণ্ডের সান্নিধ্যে কিছু সময় যাপন করতে পারাই তো সৌভাগ্যের বিষয়। উপরন্তু বসবাসের জন্য যদি এক টুকরো মাটি পাওয়া যায়, তাহলে এটা তো আরো অনেক বড় প্রাপ্তি। একারণেই হাদীস শরীফে বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু যার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا...

অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি যদি ঘোড়ার রশি পরিমাণ জায়গাও পেয়ে যায়, যেখান থেকে বাইতুল মাকদিস দেখা যায়, তাহলে এটা তার জন্য সমগ্র দুনিয়া থেকে বেশি উত্তম হবে। —মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫০, হাদীস ৮৫৫৩; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৬৯৭৯, ৮২২৬

নূরুদ্দীন হাইসামী রাহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৩/৬৭৬) বলেন—

رجاله رجال الصحيح

ইমাম হাকেম রাহ.-ও সহীহ বলেছেন।

বারো. বাইতুল মাকদিসে মৃত্যুর তামান্না

পবিত্র ভূখণ্ডে জীবন অতিবাহিত করার পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করাও একজন মুমিনের পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বাইতুল মাকদিস যেহেতু পবিত্রতম স্থান, তাই তো হযরত মূসা আ. এই

মাটিতে মৃত্যুর আরজি পেশ করেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা আ.-এর মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ.

তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁকে পবিত্র ভূখণ্ডের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে পবিত্র ভূখণ্ডে পতিত হবে। যদি আমি সেখানে থাকতাম, তবে লাল টিলার কাছে রাস্তার পাশে আমি তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৭২

এই হাদীসে পবিত্র ভূখণ্ড দ্বারা বাইতুল মাকদিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তেরো. আহলে হকের অবস্থানস্থল

বাইতুল মাকদিস এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বদা এমন একটা জামাতের উপস্থিতি থাকবে, যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু উমামা বাহিলী রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। তাদের দুশমনদের ওপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ আসবে আর তারা এভাবেই থেকে যাবে।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেসা করলেন, এই দলটির অবস্থান কোথায় হবে?

তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিস ও তার আশেপাশে। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩২০; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৭৬৪৩

নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন—

رواه عبد الله بن أحمد في المسند وجادة عن خط أبيه، والطبراني، ورجاله ثقات.

অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৫৬৪

চৌদ্দ. হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই

পৃথিবীতে মানব জাতির যাত্রালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের লড়াই, সত্য ও মিথ্যার সংঘাত। এটা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই হবে বাইতুল মাকদিস অঞ্চলে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমগণ ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে আর মুসলিমগণ তাদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা যে পাথর বা গাছের পেছনেই আত্মগোপন করবে, সে পাথর বা গাছও বলে উঠবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পেছনে ইহুদী আছে। এসো তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ গাছ কিছু বলবে না; কারণ এটা ইহুদীদের গাছ। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯২২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯২৬

ইমাম নববী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'গারকাদ' একধরনের কাঁটাদ্বার গাছ, যা বাইতুল মাকদিসে প্রচুর পরিমাণে হয়। আর সেখানেই দাজ্জাল ও ইহুদী বধের ঘটনা ঘটবে। (দ্র. শরহে মুসলিম, নববী ১৮/৪৫)

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, আলআকসা বা বাইতুল মাকদিস ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ আর মুসলিম উম্মাহ্র জন্য কতই না গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গোটা মুসলিম উম্মাহ আলআকসার বিষয়ে দায়িত্বহীনতার শিকার হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ আমাদের মাফ করুন এবং আলআকসার মুক্তির জন্য আবারো জেগে ওঠার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন। (তথ্যসূত্র:মাসিক আল কাউসার)

কোরআনে বর্ণিত ফিলিস্তন প্রসঙ্গে আয়াত

বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। বায়তুল মুকাদ্দাস অর্থ পবিত্র ঘর। মসজিদুল আকসা অর্থ দূরবর্তী মসজিদ। মসজিদুল হারামের অবস্থান থেকে মসজিদুল আকসা দূরে অবস্থিত হওয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসকে কোরআনে মসজিদুল আকসা বলা হয়েছে।

ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত এই মসজিদে মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) গমন করেন এবং সব নবী-রাসুলের ইমামতি করেন। এটি মুসলমানদের প্রথম কিবলা। পবিত্র কোরআনে বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন অঞ্চল পুণ্যভূমি হিসেবে আলোচিত হয়েছে।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা : মসজিদুল আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা।

এই মসজিদের দিকে মুখ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিরা নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের ১৭ মাস পর কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ সংবলিত আয়াত নাজিল হয়। তাতে মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারাম অভিমুখে নামাজের আদেশ দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ نَرٰي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

‘আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানো আমি অবশ্য লক্ষ করি।সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফেরাব, যা তুমি পছন্দ করো। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তার দিকেই মুখ ফেরাও। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে তা তাদের রবের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে সে ব্যাপারে আল্লাহ অনবহিত নন।

’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৪৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গমনস্থল : মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সব নবী-রাসুল সমবেত ছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছার পর আজান ও ইকামাত দেওয়া হয়। নবী-রাসুলরা কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। জিবরাইল (আ.) রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর হাত ধরে ইমামতির জন্য সামনে বাড়িয়ে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সব নবী ও রাসুলের ইমামতি করেন। (দ্র. সীরাতুল মুস্তফা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬)
তারপর তাঁর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু হয়। আল্লাহ বলেন,

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

‘পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ (সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ১)

বরকতময় ভূখণ্ড ফিলিস্তিন

পৃথিবীর এক বরকতময় স্থান। এখানে অনেক নবী-রাসুলের আবাসস্থল ছিল। ইবরাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), মুসা (আ.), দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), ঈসা (আ.) ও আরো অনেক নবী-রাসুলের অনুসারীরা এই ভূমিতে বসবাস করতেন। ফিলিস্তিন অসংখ্য নবী-রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এর আশপাশে অনেক নবী-রাসুলের সমাধি আছে। পবিত্র কোরআনের পাঁচ স্থানে মহান আল্লাহ ফিলিস্তিনকে বরকতময় ও পুণ্যময় ভূখণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

১.سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

‘যার (মসজিদুল আকসার) আশপাশে আমি বরকত নাজিল করেছি, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ (সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ১)

এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এ কারণে একে বরকতময় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২.وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَي الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

'আর আমি তাকে (ইবরাহিম) ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই ভূখণ্ডে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৭১)

বেশির ভাগ ব্যাখ্যাদাতার কাছে এ থেকে শাম (বর্তমানে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন) দেশকে বোঝানো হয়েছে, যাকে শস্য-শ্যামলতা, ফলমূল, নদ-নদীর আধিক্য ও বহু নবীর বাসস্থান হওয়ার কারণে বরকতময় ও কল্যাণময় বলা হয়েছে।

৩.وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰي عَلٰي بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ

'যে সম্প্রদায়কে (মুসা ও বনি ইসরাইলকে) দুর্বল মনে করা হতো, তাদের আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনি ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৩৭)

এখানে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমির কথা বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তাআলা কওমে ফিরআউন ও কওমে আমালেকাকে ধ্বংস করার পর বনি ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

৪.وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَي الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ

'এবং সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; সে তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই ভূখণ্ডের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৮১)

কল্যাণময় ভূখণ্ড বলতে শামকে (ফিলিস্তিন ও সিরিয়া) বোঝানো হয়েছে।

৫.وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَي الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًي ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ

'ওদের (সাবা সম্প্রদায়) ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওই সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং ওদের বলেছিলাম—তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিনে ও রাতে।' (সুরা : সাবা, আয়াত : ১৮)

এই জনপদ বলতে মুলকে শাম বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন শামদেশ হলো বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই জনপদ হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। (রুহুল মাআনি, ২২/১২৯)

এভাবে কোরআনুল কারিমে বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের অসামান্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যময় হওয়ার বিষয়টি অলোচিত হয়েছে। কাজেই তা মুসলমানদের অনুরাগ ও ভালোবাসার উৎস এবং প্রাণের চেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত হবে—এটাই স্বাভাবিক।

হাদীসে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে

ইতিহাসে প্রথম নির্মিত মসজিদ মজসিদুল হারাম হলেও এরপরের স্থানে আছে সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুজালেম শহরে অবস্থিত মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ মসজিদে আকসা। এটা নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিনবাসী মুসলমানদের জন্য বিশেষ সম্মানের বিষয়; অন্যান্য মুসলমানদেরও মূল্যবান ঠিকানা। আবু জর গিফারি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তারপর হলো মসজিদুল আকসা। অতঃপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের ব্যবধান। (সহিহ বুখারি: ৩১১৫)

হাদিসের আলোকে প্রমাণিত যে তিনটি শহর সম্মানিত— মক্কা, মদিনা ও ফিলিস্তিন বা বায়তুল মুকাদ্দাস। সহিহ বুখারিও মুসলিমে হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, '(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।' (মুসলিম: ৮২৭)

অন্য হাদিসে আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, 'মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাজ এক লাখ নামাজের সমান। আমার মসজিদে (মসজিদে নববি) এক রাকাত নামাজ এক হাজার নামাজের সমান এবং বায়তুল মাকদাসে এক নামাজ পাঁচ শ নামাজের সমান।' (মাজমাউজ জাওয়াইদ: ৪/১১)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেন, 'যখন সুলায়মান ইবনু দাউদ বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করলেন। তার মতো শাসনক্ষমতা এবং এমন রাজত্ব, যা তার পরে কাউকে প্রদান করা হবে না ও সালাত আদায়ের একনিষ্ঠ মনে উক্ত মসজিদে আগমনকারীর পাপ মোছন করে তার জন্মের দিনের মতো নিষ্পাপ করার প্রার্থনা করেছেন।' নবীজি (স.) বললেন, 'আল্লাহ তার আবেদনের ভিত্তিতে তাকে দুটি প্রদান করেছেন। তৃতীয়টিও কবুল করবেন বলে প্রত্যাশা করছি।' (সুনানে ইবনু মাজাহ: ১৪৭৯)

ইসলামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হজ মুমিনদের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল। তবে বিশেষ অবস্থার কারণে ফিলিস্তিনের হজযাত্রীদের জন্য নবীজি (স.) বিশেষ অফার ঘোষণা করেছেন।

হজের নির্ধারিত সওয়াব তো থাকছেই, সাথে আছে আরও ফজিলত। উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদে হারামে হজ কিংবা ওমরা পালনে গমন করবে তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিংবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।' (সুনানে আবু দাউদ: ১৪৭৯)

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কোথায় থাকবেন? রাসুল (স.) বললেন, 'তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশপাশে থাকবেন।' (মুসনাদে আহমদ: ২১২৮৬)

মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল (স.)-কে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে কিছু বলুন!' রাসুল (স.) বললেন, 'বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে সালাত আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সওয়ার পাওয়া যায়।' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসাতে গমনের শক্তি-সামর্থ্য রাখেন না তার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?' তিনি বললেন, "সে যেন তার জন্য জ্বালানি তেল হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কেননা যে বায়তুল মাকদিসের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করে, সে তাতে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মতো সওয়ার লাভ করবে।" (মুসনাদে আহমদ: ২৬৩৪৩)

ফিলিস্তিনি জাতি মাটি কামড়ে লড়ে যাওয়া নিবেদিত লড়াকু হাজারো বীরের দেশ। ইতিহাসের মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আয়ুবি ও বাইবার্সের দেশ ফিলিস্তিন। এ পবিত্র ভূমিতে কেয়ামত অবধি মায়েদের কোল আলোকিত করে জন্ম নেবে— হাজারো রথী-মহারথী ও বীরপুরুষ। মুজাহিদরা কেয়ামত পর্যন্ত নিবেদিত থাকবেন— ফিলিস্তিনের মাটিতে। এ প্রসঙ্গে উমামা (রা.) বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন- 'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর বিজয়ী থাকেবে, শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে, দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্যকোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না; আল্লাহর আদেশ তথা কেয়মত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কোথায়? রাসুল (স.) বললেন, 'তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশেপাশে।' (মুসনাদে আহমদ: ২১২৮৬)

পৃথিবীতে মক্কা মদিনার পরে আল্লাহর পছন্দনীয় ভূমি হলো ফিলিস্তিন। এছাড়াও তার আরো অনেক প্রিয় স্থান সম্পর্কে আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি। ইবনে হাওয়ালা (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'ইসলামি বাহিনী শিগগিরই কয়েকটি দলে দলবদ্ধ হবে। একটি দল শামে, একটি ইয়েমেনে ও অন্য একটি ইরাকে। ইবনে হাওয়ালা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি সে যুগ পাই, তখন আমি কোন দলটিতে যোগদান করব, তা বলে

দিন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, তুমি শামের বাহিনীতে থাকবে, কেননা তা আল্লাহর পছন্দনীয় ভূমির একটি, সেখানে তিনি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাদের একত্র করবেন। আর যদি তুমি তাতে যোগদান না করো, তাহলে তুমি ইয়েমেনের বাহিনীকে গ্রহণ করো, আর তোমরা শামের কূপ থেকে পানি গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ আমার জন্য—অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য শাম ভূখণ্ড ও তার বাসিন্দাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।' (আবু দাউদ: ২৪৮৩)

নববী জীবনের ত্রয়োদশতম বছরে সংঘটিত হলো মক্কা থেকে মদিনার হিজরত। এরপর পৃথিবীতে সংঘটিত হবে মহা হিজরত। আর সে হিজরত হবে ইবরাহিম (আ.)-এর হিজরতভূমির দিকে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে, যারা ওই জায়গায় হিজরত করবে, যে জায়গায় হযরত ইবরাহিম (আ.) হিজরত করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে— এ ধরাপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম যারা ইবরাহিম (আ.)-এর হিজরতের স্থানকে নিজেদের হিজরতস্থল বানাবে। এ সময় কেবল মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘৃণা করবেন। অতঃপর একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শুকরের দলসহ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাতযাপন করবে, আগুনও সেখানে রাত কাটাবে। আর যেখানে তারা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানে বিশ্রাম করবে। (সুনানে আবু দাউদ: ২১২৩)

এসব কারণে ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ভূখণ্ড। ফিলিস্তিনকে ভালোবাসা এবং মসজিদুল আকসার সংরক্ষণ ও পবিত্রতা রক্ষায় তাদের পাশে থাকা ঈমানের দাবি। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সেই তাওফিক দান করুন। আমিন।

ফিলিস্তিন ভূখন্ড নিয়ে নবী মুহাম্মাদ সা: এর ভবিষ্যৎবানী

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে শামদেশ বলতে বর্তমান সময়ের সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে বোঝানো হতো। অনেক নবী-রাসুলের আগমন ঘটেছে এই অঞ্চলে। কিয়ামতের আগে ঈসা (আ.) এ অঞ্চলে আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল সেখানেই নিহত হবে। এখানেই হবে কিয়ামতের ময়দান।

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সব মানুষ সেখানে সমবেত হবে। শামদেশ এবং বিশেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশের এলাকা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

সত্যবাদী দলের অবস্থান : উম্মতের মধ্যে একদল বিশেষ শ্রেণির লোক থাকবে, যারা সত্যের পথে লড়াই করতে থাকবে। তাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে।তারা সত্যের পক্ষের সংগ্রামকে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে। কেউ তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না।

হাদিসের ভাষ্যমতে, এ দলটি শামদেশ অঞ্চলের অবস্থানকারী হবে। মুগিরা ইবন শোবা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের এক দল সব সময় (সত্যের ওপর) বিজয়ী থাকবে।এভাবে কিয়ামত এসে যাবে আর তারা বিজয়ীই থাকবে। (বুখারি, হাদিস : ৭৩১১)

তাদের অবস্থানস্থল আরেক হাদিসে পাওয়া যায়। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধীপক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না।

আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কোথায় থাকবে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা বায়তুল মাকদিস ও তার আশপাশে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ: ২২৩২০)

ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ও হাশরের ময়দান : মসজিদুল আকসা সব সাহাবির হৃদয়ে উপস্থিত ছিল। নারী সাহাবিদের মনেও এর প্রতি ছিল ভালোবাসা ও অনুরাগ। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই মসজিদুল আকসায় যেতে ও নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করেছেন। তবে এমন সময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদুল আকসায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে না। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। তা হলো- বায়তুল মুকাদ্দাস ও সেখানে অবস্থানকারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। মসজিদুল আকসা আলোকিত করতে অবদান রাখা। অনেক সাহাবি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জেরুজালেমে বাতি জ্বালাতে তেল কেনার জন্য প্রতিবছর অর্থ পাঠাতেন। মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন, বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে নামাজ আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মতো । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য রাখে না তার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তিনি বলেন, সে যেন তার জন্য জ্বালানি তেল হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে শামদেশ বলতে বর্তমান সময়ের সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে বোঝানো হতো। অনেক নবী-রাসুলের আগমন ঘটেছে এই অঞ্চলে। কিয়ামতের আগে ঈসা (আ.) এ অঞ্চলে আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল সেখানেই নিহত হবে। এখানেই হবে কিয়ামতের ময়দান।

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সব মানুষ সেখানে সমবেত হবে। শামদেশ এবং বিশেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশের এলাকা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

সত্যবাদী দলের অবস্থান : উম্মতের মধ্যে একদল বিশেষ শ্রেণির লোক থাকবে, যারা সত্যের পথে লড়াই করতে থাকবে। তাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে।

তারা সত্যের পক্ষের সংগ্রামকে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে। কেউ তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না। হাদিসের ভাষ্যমতে, এ দলটি শামদেশ অঞ্চলের অবস্থানকারী হবে।

মুগিরা ইবন শোবা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের এক দল সব সময় (সত্যের ওপর) বিজয়ী থাকবে।এভাবে কিয়ামত এসে যাবে আর তারা বিজয়ীই থাকবে। (বুখারি, হাদিস : ৭৩১১)

তাদের অবস্থানস্থল আরেক হাদিসে পাওয়া যায়। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধীপক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না।

আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কোথায় থাকবে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা বায়তুল মাকদিস ও তার আশপাশে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ: ২২৩২০)

ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ও হাশরের ময়দান : মসজিদুল আকসা সব সাহাবির হৃদয়ে উপস্থিত ছিল। নারী সাহাবিদের মনেও এর প্রতি ছিল ভালোবাসা ও অনুরাগ। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই মসজিদুল আকসায় যেতে ও নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করেছেন। তবে এমন সময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদুল আকসায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে না। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। তা হলো- বায়তুল মুকাদ্দাস ও সেখানে অবস্থানকারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। মসজিদুল আকসা আলোকিত করতে অবদান রাখা। অনেক সাহাবি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জেরুজালেমে বাতি জ্বালাতে তেল কেনার জন্য প্রতিবছর অর্থ পাঠাতেন। মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন, বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে নামাজ আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মতো । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার শক্তি-সামর্থ্য রাখে না তার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তিনি বলেন, সে যেন তার জন্য জ্বালানি তেল হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কেননা যে বায়তুল মাকদিসের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করে, সে তাতে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মতো সওয়াব লাভ করবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস, ২৭৬২৬)

ঈসা (আ.) এর অবতরণস্থল ও দাজ্জালের মৃত্যুস্থান : ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) দ্বিতীয় আকাশে অবস্থান করছেন। কিয়ামতের আগে তিনি আবার পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি দুজন ফেরেশতার ডানায় ভর করে সিরিয়ার দামেস্ক শহরে শুভ্র মিনারার কাছে নেমে আসবেন। আবার সিরিয়ার বাবে লুদ নামক স্থানে দাজ্জালকে মেরে ফেলবেন। নাওয়াস ইবন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার দাজ্জাল প্রসঙ্গে দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা করেছেন।...এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তখন আল্লাহ ঈসা ইবন মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দুজন ফেরেশতার কাঁধের ওপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রংয়ের জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেস্ক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা ঝুঁকাবেন তখন

ফোঁটা ফোঁটা ঘাম তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যেকোনো কাফিরের কাছে যাবেন সে তাঁর শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে (সিরিয়ার) বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। (মুসলিম, হাদিস : ২৯৩৭)

মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরত ভূমি : ইসলামে হিজরত বলতে সাধারণত রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের মক্কা থেকে মদিনার হিজরতকে বোঝায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শামের লোকজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হবে এবং তাদের দিকে আরেকটি হিজরত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, হিজরতের পর আরেকটি হিজরত শিগগির সংঘটিত হবে। তখন ভূপৃষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হবে তারাই, যারা ইবরাহিম (আ.)-এর হিজরতভূমিতে (শামদেশে) অবস্থান করবে। আর গোটা পৃথিবীতে সর্বনিকৃষ্ট মানুষ বাকি থাকবে। তাদের ভূমিগুলো তাদের নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদের অপছন্দ করবেন। তাদের ফিতনার আগুন বানর ও শূকরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে (তাদের দুশ্চরিত্রের কারণে তারা যেখানেই যাবে, সেখানেই ফিতনা লেগে থাকবে)। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৮২)

মুসলমানদের সেনাছাউনি : একসময় মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হবে। দামেস্ক নগরী আর তাদের সেনাছাউনি হবে। তার পার্শ্ববর্তী গোতা নগরী। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মহাযুদ্ধের সময় মুসলিমদের ছাউনি হবে গোতা শহরে, যা দামেস্ক শহরের পাশে অবস্থিত। এটি শামের উৎকৃষ্ট শহরগুলোর একটি।

(আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৯৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, অচিরেই তোমরা শাম বিজয় করতে পারবে, যখন তোমাদের সেখানে বসবাসের এখতিয়ার দেওয়া হবে, তোমরা দামেস্ক নগরীকে বাসস্থান বানাবে, কেননা তা যুদ্ধবর্তীকালীন মুসলিমদের আশ্রয়স্থল হবে, আর তাদের ছাউনি হবে সে দেশের একটি ভূমি, যাকে গোতা বলা হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৪৭০)

এসব ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করে যে কিয়ামত যত ঘনিয়ে আসবে, ফিলিস্তিন অঞ্চল ততই আলোচিত ও অপরিহার্য অঞ্চলে পরিণত হবে। ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি সে দিকেই যাচ্ছে বলে মনে হয়। আল্লাহ তাআলা শামদেশ তথা নির্যাতিত জনপদ সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ সব মুসলিম অঞ্চলকে হেফাজত করুন। আমিন।

মেরাজের ঘটনা

ইসরা ও মিরাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। মুমিনের ভক্তি ও বিশ্বাস এবং আবেগ ও অনুভূতির শেকড় গভীরভাবে মিশে আছে যার সঙ্গে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াতে নিজেকে বিলীন

করে দিচ্ছেন। কাফেরদের নির্মম অত্যাচার ও অবর্ণনীয় বাক্যবাণে তিনি বিধ্বস্ত। মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম জুলুম-অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট। তবুও হৃদয়ে তারা ঈমানের আলো জ্বেলে রেখেছেন। এভাবেই এগিয়ে চলছে ইসলামের প্রচার-প্রসার। আশ্রয় ও সান্ত¦নার বিরাট দুটি বৃক্ষ একে একে চলে গেছেন। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। খাজা আবু তালিব ও উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা রা.। আশা ছিল, তায়েফবাসী যদি কথাগুলো একটু মেনে নেয়! তাওহীদের দাওয়াত কবুল করে! না, তারাও সাড়া দিল না। শুধু কি তাই, নির্দয়ভাবে ক্ষতবিক্ষত করল প্রাণপ্রিয় নবীজীকে। এমন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ডেকে নিলেন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বজগতে। রাতের এক খণ্ডে, জিবরাঈলকে পাঠিয়ে, বুরাকে চড়িয়ে। কুরআনের ভাষায়-

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕاِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ.

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। -সূরা ইসরা (১৭) : ১

বস্তুত ইসরা হচ্ছে, মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের সেই পর্বটুকু, যা রাতের একটি অংশে সংঘটিত হয়েছিল। আর মিরাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঊর্ধ্বজগৎ পরিভ্রমণের সেই বিস্তৃত অধ্যায়।

আল্লাহ তাআলা সূরা নাজমে আরো বলেন-

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰی، اِذْ یَغْشَی السِّدْرَةَ مَا یَغْشٰی،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰی، لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی.

বস্তুত সে তাকে (হযরত জিবরাঈল আ.-কে) আরও একবার দেখেছে। সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তবতীর্ কুলগাছ)-এর কাছে। তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস, যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ ধেঁাকায় পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি তা লংঘনও করেননি যে, তার সামনে কী আছে তা দেখতে যাবে।) বাস্তবিকপক্ষে, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে। -সূরা নাজম (৫৩) : ১৩-১৮

ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনায় সংক্ষেপে এতটুকুই বলা হয়েছে। আর বিস্তারিত এসেছে হাদীসের পাঠগুলোতে। সীরাত, সুন্নাহ এবং তারীখের নির্ভরযোগ্য সূত্রে রয়েছে এর বিশদ বিবরণ। পবিত্র কালামুল্লাহর এই আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা হচ্ছে-

ক. আল্লাহ তাআলা পবিত্র সত্তা। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর শক্তি ও সক্ষমতা। তিনি তার বান্দাকে রাতে পরিভ্রমণ করিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্ব প্রকার সংশয় ও দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খ. ইসরা ও মিরাজ রাতে সংঘটিত হয়েছিল।
গ. মক্কা মুকাররমা থেকে নবীজীকে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে নবীজী ঊর্ধ্বজগতে আরোহিত হন।
ঘ. বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার চারপাশের এলাকা বরকতময়।
ঙ. আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের নিআমত দান করেছেন তিনি তার বড় বড় কুদরত ও নিশানা দেখাবেন বলে।
চ. মিরাজের বিষয়টি এমন, যা সাধারণ বোধগম্য বিষয় নয়। এটা কেবলই মহান রবের কুদরতের কারিশমা। মাখলুকের সীমাবদ্ধ হিসাব-নিকাশ সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়... ইত্যাদি।
এ তো গেল কুরআন কারীমের বিবরণ প্রসঙ্গ। সেখানে ইসরা ও মেরাজের বিবরণ এসেছে সংক্ষেপে। বিস্তারিত বিবরণ এসেছে হাদীস শরীফে। কিছু দীর্ঘ হাদীসে মেরাজের মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আর কিছু হাদীসের বিভিন্ন পাঠ থেকে মিরাজের টুকরো টুকরো বর্ণনা পাওয়া যায়। সে হাদীসগুলো সামনে রেখে মিরাজের ঘটনা নিম্নরূপ-
হিজরতের পূর্বের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে শুয়ে ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন। চোখদুটো মুদে এসেছে বটে, তবে দিল ছিল জাগ্রত। এরই মাঝে আগমন করলেন হযরত জিবরাঈল আ.। তিনি নবীজীকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন যমযমের নিকট। একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনা হল। তা ছিল ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ। তাতে যমযমের পানি। জিবরাঈল আ. নবীজীর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করলেন। বের করে আনলেন নবীজীর হৃদয়। যমযমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে আবার প্রতিস্থাপন করে দিলেন জায়গামত। ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ করে দেওয়া হল নবীজীর কলব।
এরপর আনা হল নবীজীকে বহন করার জন্য সওয়ারী। প্রাণীটি গাধার চেয়ে বড়, ঘোড়া থেকে ছোট। নাম বুরাক। রং সাদা। এটা এতটাই ক্ষিপ্রগতির যার এককেটি কদম পড়ে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে।
এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তেই পৌঁছে গেলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। বুরাক বেঁধে রাখা হল পাথর ছিদ্র করে। যে পাথরে অপরাপর নবীগণ নিজেদের বাহন বেঁধে রাখতেন। নবীজী সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায পড়ে বের হওয়ার সময় জিবরাঈল আ. নবীজীর সামনে দুটি পেয়ালা পেশ করলেন। একটি দুধের অপরটি শরাবের। নবীজী দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল আ. বললেন, আপনি (দ্বীনের) স্বভাবসিদ্ধ বিষয়টি নির্বাচন করেছেন।
নবীজী মদের পেয়ালা নেওয়ার পরিবর্তে দুধের পেয়ালা গ্রহণ করায় জিবরীল আ. বলেন, আপনি যদি মদের পেয়ালা নিতেন তাহলে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৯৪)

এরপর শুরু হল ঊর্ধ্বজগতের সফর। জিবরাঈল নবীজীকে নিয়ে চললেন। প্রথম আসমানে গিয়ে দস্তক দিলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, কে? বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞাসা করা হল, তার কাছে কি আপনাকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। এরপর নবীজীকে সম্ভাষণ জানানো হল- মারহাবা, উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে! খুলে দেওয়া হল নবীজীর জন্য আসমানের দরজা।

নবীজী প্রথম আসমানে গেলেন। সেখানে ছিলেন হযরত আদম আ.। জিবরাঈল পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবীজী হযরত আদমকে সালাম বললেন। বাবা আদম জবাব দিলেন। নবীজীকে সাদর অভিবাদন জানালেন- মারহাবা, নেককার পুত্র ও নেককার নবী। হযরত আদম আ. নবীজীর জন্য দুআ করলেন।

এরপর নবীজী উঠতে থাকলেন দ্বিতীয় আসমানের দিকে। সেখানেও দরজা খুলতে প্রথম আসমানের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। এরপর নবীজীকে ইস্তেকবাল করা হল। নবীজী সেখানে দেখতে পেলেন দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা আ. ও হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে। তাদের সাথে নবীজীর সালাম বিনিময় হল। তারা নবীজীকে স্বাগত জানালেন- মারহাবা, আমাদের পুণ্যবান ভাই এবং সজ্জন নবী। তারা নবীজীর জন্য দুআ করলেন।

এরপর নবীজীকে তৃতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও দুই আসমানের মতো জিজ্ঞাসাবাদ হল এবং নবীজীকে স্বাগত জানানো হল। সেখানে গিয়ে দেখলেন হযরত ইউসুফ আ.। হযরত ইউসুফের সাথে নবীজীর সালাম ও কুশল বিনিময় হল। নবীজী বলেন, হযরত ইউসুফকে যেন দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে!

এরপর চললেন চতুর্থ আসমানের দিকে। সেখানেও পূর্বের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। স্বাগত-সম্মান জানানো হল। সেখানে হযরত ইদরীস আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। সালাম ও কুশল বিনিময় হল। হযরত ইদরীস আ. নবীজীর জন্য দুআ করলেন।

এরপর চললেন পঞ্চম আসমানের দিকে। সেখানে হযরত হারূন আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হল।

এরপর চললেন ষষ্ঠ আসমানের দিকে। সেখানেও পূর্বের পর্বগুলোর মতো জিজ্ঞাসা করা হল। নবীজীকে অভিনন্দন জানানো হল। সেখানে দেখা হল হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. নবীজীকে খুব ইস্তেকবাল করলেন।

এরপর নবীজী সপ্তম আসমানের দিকে উঠতে থাকেন। সেখানে দেখা হল হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে। জিবরাঈল আ. পরিচয় করিয়ে দিলেন- ইনি আপনার পিতা, সালাম করুন। নবীজী হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে সালাম বিনিময় করলেন।

নবীজী বলেন, হযরত ইবরাহীম আ. তখন বাইতুল মামুরে হেলান দিয়ে ছিলেন। বাইতুল মামুর, যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসে। এরপর এই সত্তর হাজার আর ফিরে আসে না। এভাবে প্রতিদিন সত্তর হাজার করে ফেরেশতাদের নতুন নতুন কাফেলা আসতে থাকে।

এরপর নবীজীকে নিয়ে যাওয়া হল সিদরাতুল মুনতাহার দিকে। সেই কুল বৃক্ষের একেকটি পাতা হাতির কানের মতো। আর একেকটি ফল মটকার মতো বড় বড়। যখন ওটাকে আল্লাহর বিধান আচ্ছন্ন করে নিল তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সৃষ্টির কারো সাধ্য নেই তার সৌন্দর্যের বিবরণ দেবার। জিবরাঈল বললেন, এটা সিদরাতুল মুনতাহা। এখানে চারটি নহর। দুটি অদৃশ্য আর দুটি দৃশ্যমান। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, দৃশ্যমান নদীদুটি কোনগুলো? জিবরাঈল বললেন, অদৃশ্যমান দুটি জান্নাতে। আর দৃশ্যমান দুটি হল নীল নদ ও ফুরাত নদী।

এরপর আল্লাহ তাআলা নবীজীর প্রতি যে ওহী পাঠানোর পাঠালেন। দিনরাতে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিলেন। নবীজী আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের এ হাদিয়া নিয়ে ফেরত আসছিলেন; এর মধ্যে দেখা হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য কী দিয়েছেন? নবীজী বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। হযরত মূসা বললেন, আপনার উম্মত রাত-দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবে না। আপনার আগে আমি উম্মত চালিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে কমিয়ে আনেন। নবীজী সে মতে আল্লাহর কাছে গিয়ে কম করে দেওয়ার দরখাস্ত করলেন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। নবীজী তা নিয়ে ফেরত আসছিলেন। আবার হযরত মূসা আ.-এর সাথে দেখা হল। বললেন, আপনার উম্মত তা পারবে না। আপনি আরো কমিয়ে আনুন। নবীজী আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে আগের মতো দরখাস্ত করে আরো পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে আনলেন। নবীজী বলেন, এভাবে আমি আল্লাহ ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকি। শেষবার আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ! এই হল দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। প্রত্যেক নামাযের বিনিময়ে দশ নামাযের সাওয়াব। এভাবে বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব পাবে। কেউ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করবে কিন্তু করতে পারবে না, তার জন্যও নেকী রয়েছে। এক নেকী। আর যদি ভালো কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশ নেকী। আর কেউ কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হবে না। তবে তা করে বসলে একটি গুনাহ লেখা হবে।

নবীজী এ সওগাত নিয়ে ফেরত আসছিলেন। হযরত মূসার সাথে দেখা হল। মূসা আ. এবার শুনে বললেন, আপনি যান, আরো কমিয়ে আনুন। আপনার উম্মত পারবে না। বনী ইসরাঈলের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। নবীজী বললেন, আমার আর কিছু বলতে লজ্জা হচ্ছে!

(দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২, ১৬৪)

নবীজীকে যখন বুরাকে তোলা হচ্ছিল তখন বুরাক ঔদ্ধত্য দেখাল। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে এরকম করছিস! তোর উপর তো এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ কোনোদিন চড়েনি। এ শুনে বুরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। (দ্রষ্টব্য : জামে তিরমিযী, হাদীস ৩১৩১)

আল্লাহ তাআলা নবীজীর জন্য যে বিশেষ উপহার হাউযে কাউসার রেখেছেন প্রথম আসমানে নবীজীকে তা দেখানো হয়। নবীজী সেই কাউসারের বিবরণও দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১৭)

নবীজী যখন প্রথম আসমানে যান দেখেন এক ব্যক্তি, তার ডান পাশে কিছু রূহ আর বাম পাশে কিছু রূহের কাফেলা। তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন আর বাম দিকে তাকালে কাঁদেন। তিনি নবীজীকে সম্ভাষণ জানালেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি আদম আ.। আর তার দুই পাশে তার সন্তানদের রূহ। ডানদিকেরগুলো জান্নাতী আর বামদিকেরগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন আর বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৪২)

এ সফরে নবীজীকে জান্নাত-জাহান্নামের ভ্রমণও করানো হয়। নবীজী বলেন, জান্নাতের প্রাসাদগুলো মুক্তার তৈরি আর তার মাটি হল মেশকের। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১৭)

নবীজী এ সফরে একদল লোককে দেখলেন, তাদের নখগুলো তামার। নিজেদের নখ দিয়ে তারা নিজের গাল ও বুকে আঁচড় কাটছে। জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল, এরা কারা?

বললেন, এরা ওই সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের সম্ভ্রমে আঘাত হানত। অর্থাৎ গীবত করত এবং মানুষকে লাঞ্ছিত করত। (দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৩৪০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮)

নবীজী এ সফরে হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর শারীরিক গড়নেরও বিবরণ দেন। নবীজী বলেন, আমি ইবরাহীমের আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৯৪)

হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে মুলাকাত হলে তিনি নবীজীকে বলেন, আপনি আপনার উম্মতের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আর তাদেরকে বলবেন, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও সুঘ্রাণযুক্ত, এর পানি সুমিষ্ট এবং এর ভূমি উর্বর ও সমতল। আর এর বৃক্ষ হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر.

(দ্রষ্টব্য : জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৬২)

এ সফরে নবীজীকে তিনটি উপহার দেওয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো এবং এই উম্মতের যারা শিরক থেকে বেঁচে থেকে মৃত্যুবরণ করবে তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৩)

এ সফরে নবীজীর সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি নামাযে সকলের ইমামতি করেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

এ সফরে নবীজী দেখলেন, একদল লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা?

জিবরাঈল বললেন, এরা বক্তৃতা করত বটে, কিন্তু নিজেরা আমল করত না। (দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২১১, ১২৮৫৬)

মিরাজ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীমে বসা। মুশরিকরা ইসরা ও মেরাজের ঘটনা শুনে উপহাস ও কটাক্ষ করতে লাগল। বিভিন্নভাবে নবীজীর দিকে প্রশ্নের তীর ছুড়তে লাগল। তারা চাইল, বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ণ বিবরণ শুনবে। নবীজী এমন প্রশ্নে খুবই বিব্রত হয়ে ওঠেন। এত রাতে কি বাইতুল মুকাদ্দাসকে ওরকম নিখুঁতভাবে দেখতে গিয়েছেন নাকি! নবীজী বলেন, এরকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমি আগে পড়িনি। আল্লাহ তাআলা প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করলেন। নবীজীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দৃশ্য। নবীজী দেখে দেখে তাদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার বিস্তারিত জবাব দিলেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

মিরাজের ঘটনা এবং আমাদের করণীয়

মিরাজের ঘটনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতিটি মুমিনের ঈমান ও আবেগ জড়িয়ে আছে এর সাথে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় আছে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে করণীয় তা হচ্ছে, মেরাজের ব্যাপারে সহীহ আকীদা পোষণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাতে সশরীরে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সাত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নাম ভ্রমণ করিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা স্বীয় বড় বড় কিছু কুদরত প্রিয় হাবীবকে দেখাবেন বলে। এটা সীরাতে রাসূলের একটি বড় অধ্যায় এবং নবী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা। এটা মুসলমানের অকাট্য মৌলিক আকীদার অংশ। অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় তা স্বীকৃত ও সুসাব্যস্ত। তাই এক্ষেত্রে স্বচ্ছ বিশ্বাস রাখা জরুরি।

মিরাজ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মুজিযা। আর মুজিযা ওই ঘটনাকেই বলা হয়, যা সাধারণ সক্ষমতার বাইরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সংঘটিত হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবিত হয়ে অনেকে একে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে চান। এটা ইসলামের এবং ইসলামের দাওয়াতের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া নয়। কখনো কখনো এমনসব বৈজ্ঞানিক থিউরি শোনানো হয়, যা অনেকসময় হাস্যকর সাব্যস্ত হয়। তাই ইসলামের বিধিবিধান ও শাআইরগুলোকে ইসলামের স্বভাববোধ থেকে অনুধাবন করা এবং এর মাধ্যমে নিজের ঈমানী যিন্দেগী বিনির্মাণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের শান।

মিরাজের ঘটনা থেকে সরলদাগে যে শিক্ষাগুলো পাওয়া যায় সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ-

ক. আল্লাহর সত্তার উপর পূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাস রাখা। শিরক থেকে বিলকুল বেঁচে থাকা।

খ. আল্লাহর সাথে বান্দার আবদিয়াত তথা দাসত্বের সম্পর্ক মজবুত করা।

গ. নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা এটা মিরাজে লাভ করা উম্মতের জন্য নবীজীর তোহফা। বস্তুত নামায এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে রবের সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মধুময় হতে থাকে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন নামায পড়ে তখন সে তার রবের সাথে নিভৃতে আলাপ করে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৫)

ঘ. সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর শিক্ষা ও মর্মগুলো ধারণ করা। এখানে মুমিনের ঈমানের শিরোনামগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

ঙ. আল্লাহর হক ও বান্দার হকের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

চ. গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। মানুষের সম্ভ্রমহানি না করা। কাউকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না করা। এটা অনেক বড় কবীরা গুনাহ।

ছ. শুধু লম্বা লম্বা বক্তৃতা নয়, খেয়াল করা- মানুষকে যে নসীহত করছি, আমার মাঝে তা কতটুকু আছে।

জ. জান্নাতের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

ঝ. জাহান্নামের ব্যাপারে ভীত থাকা।

ঞ. হাউযে কাউসারের প্রত্যাশী হওয়া।

ট. হযরত ইবরাহীম আ. যে দুআর কথা বলেছেন-

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر.

এই দুআর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ঠ. সকল প্রকার গুনাহ, বিশেষ করে মদ ও গীবত থেকে বেঁচে থাকা।

সবশেষে বলতে হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই পবিত্র ও বরকতময় ভূমিতে ইসরা ঘটেছে সেই বাইতুল মুকাদ্দাস আজ তারই উম্মতের জন্য অনিরাপদ এক লীলাভূমি। আজ মুসলমানদের হাত থেকে বেদখল পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস ও জেরুযালেম। সেখানে ভেসে যায় আমার ভাইয়ের রক্ত। কিন্তু তার জন্যে আমার-আপনার হৃদয়ে কতটুকু রক্তক্ষরণ হয়!

এছাড়া আরো অনেক শিক্ষার উপলক্ষ হচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ও মিরাজ। আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে বাস্তবানুগ এই শিক্ষাগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

বিভিন্ন শাসনামলে আল আকসার সংস্কার

মুসলিম শাসনামলে মুসলিম শাসকদের মসজিদুল আকসার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল। যখন মসজিদুল আকসার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হতো তখন তাঁরা এগিয়ে আসতেন। নিচে বিভিন্ন শাসনামলে মসজিদুল আকসার সংস্কারের ইতিহাস তুলে ধরা হলো :

ফারুকির শাসনামল:

১৪ হিজরিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেন। অতঃপর উমর (রা.)-এর নির্দেশে কুব্বাত আস সাখরা থেকে ময়লা-আবর্জনা সরানো শুরু হয়।তিনি নিজেই এই মহৎ কাজ শুরু করেন। নিজ চাদর বিছিয়ে তাতে ময়লা-আবর্জনা উঠাতে থাকেন। অন্য সাহাবিরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই এই জায়গা পবিত্র করা হয়।অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন, যা আজও মসজিদে উমর নামে প্রসিদ্ধ।

উমাইয়া শাসনামল:

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৫ থেকে ৮৬ হিজরি) ওমরের যুগে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং এর উত্তর দিকে একটি গম্বুজ নির্মাণের নির্দেশ দেন। গম্বুজটিকে একটি প্রাসাদের মতো করে নির্মাণ করা হয়। তার চারটি গেট বানানো হয়।

ছাদে শাল কাঠের ৬০ হাজার টুকরা দিয়ে কারুকার্য করা হয়। এক হাজার প্রদীপ দ্বারা আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

মসজিদে আকসার হারামের জন্য ২০টি দরজা বানানো হয়। ভেতরে আলোর জন্য পাঁচ হাজার বাতি যুক্ত করা হয় এবং ৫০টি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়।

তিনি মারা যাওয়ার সময় নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ ছিল।

তাঁর পুত্র ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে সোনালি গম্বুজের নির্মাণকাজ শেষ করেন। এখনো এটি ইসলামী স্থাপত্যের বিরল রত্ন হিসেবে বিবেচিত হয়।

আব্বাসীয় শাসনামল:

আব্বাসীয় শাসনামলে একটি মারাত্মক ভূমিকম্প হয়। এতে আল-আকসা মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম অংশগুলো ভেঙে পড়ে। আবু জাফর মনসুর মসজিদের দরজায় মোড়ানো সোনা ও রুপার টুকরাগুলো বিক্রি করেন এবং তা দিয়ে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। তবে ১৫৮ হিজরিতে আবার ভূমিকম্প হয়। তখন তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সময় খলিফা ছিলেন মাহদি। তিনি নিজেই বায়তুল মুকাদ্দাসে যান। ১৬৩ হিজরিতে তিনি মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ করেন।

ফাতিমি শাসনামল:

৪০৬ হিজরিতে আল হাকিম বিআমারিল্লাহর শাসনকালে একটি বড় ভূমিকম্প হয়। এর ফলে মসজিদুল আকসা ও কুব্বাত আস সাখরার অনেক অংশ মাটি থেকে পড়ে যায়। ৪১২ হিজরিতে আজ জাহির খলিফা ছিলেন। তিনি তাঁর উজিরকে মসজিদের পতিত অংশ পুনর্নির্মাণ এবং ফাটা দেয়াল মেরামত করার নির্দেশ দেন। তিনি নির্মাণ ও মেরামতের কাজ পরিচালনা করেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দুটি বারান্দা ভেঙে মসজিদটিকে আরো

ছোট করেন। ৪২৫ হিজরিতে আরেকটি ভূমিকম্প হলে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো সংস্কার করা হয়। একইভাবে খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ ৪৪৮ হিজরিতে মসজিদে আকসার উত্তর দেয়াল এবং ভাঙা অংশগুলো পুনর্নির্মাণ করেন।

আইয়ুবি শাসনামল:

সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি ৫৮৩ হিজরির ২৬ রজব ক্রুসেডারদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করেন। অতঃপর ডোম অব দ্য রকের মূর্তি ও ক্রুশ ভেঙে ফেলা হয় এবং মসজিদের আসল ইসলামিক রূপ ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর আল-আকসা মসজিদের জন্য নূরুদ্দীন জাঙ্গি দ্বারা নির্মিত মিম্বরটি আল-আকসা মসজিদে আনা হয়েছিল এবং মসজিদের মিহরাবের কাছে স্থাপন করা হয়েছিল।

মামলুক শাসনামল:

৬৬১ হিজরিতে মামলুক সুলতান আল-জাহির আল-আকসা মসজিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। একটি সরাইখানাও তৈরি করেন, যেখানে প্রচুর বণিক থাকতেন। তারপর তিনি মসজিদের আশপাশের বেশির ভাগ সম্পত্তি আল-আকসা মসজিদে উৎসর্গ করেন, যার আয় ভ্রমণকারী ও অভাবীদের সাহায্য করার জন্য ব্যয় করা হতো। তিনি মসজিদুল আকসার ব্যয়ের জন্য পাঁচ হাজার দিরহামের বার্ষিক বাজেটও অনুমোদন করেন। এ ছাড়া মামলুক শাসনামলে মসজিদুল আকসার অভ্যন্তরে মাদরাসা তানকাজিয়া, বাব আল-আসবাতের ওপর একটি মিনার, একটি জলের ফোয়ারা এবং বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত মিম্বারও তৈরি করেছিলেন।

উসমানি শাসনামল:

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উসমানি শাসনামলে পাঁচজন সুলতান আল-আকসা মসজিদের নির্মাণ ও অলংকরণে বিশেষ মনোযোগ দেন। বায়তুল মাকদিসের বাইরের চার দেয়াল নতুনভাবে নির্মাণ করেন। মসজিদের জানালায় রঙিন কাচ স্থাপন করা হয়। সুন্দর কার্পেট বিছানো হয়েছিল, রুপার মোমবাতি স্থাপন করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল এবং পুরনো রাস্তাগুলো নতুন করে তৈরি করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনামল:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর জেরুজালেম শাসনের অস্থায়ী কর্তৃত্ব ব্রিটেনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তখন একটি উচ্চ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আল-আকসা মসজিদের সুরক্ষার জন্য দায়িত্ব পালন করেছিল এবং যখন পুনর্নির্মাণের কাজ প্রয়োজন হতো তখন তারা গুরুত্বের সঙ্গে তা সম্পন্ন করত।

ইহুদিবাদী শাসনামল:

১৯৪৮ সালে ইসরায়েলের অভ্যুদয়ের পর প্রাচীন জেরুজালেম জর্দানের হেফাজতে আসে। তখন মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে আল-আকসা মসজিদের নির্মাণ ও সংস্কার চলতে থাকে।

১৯৫২ সালে পাঁচ লাখ ২৫ হাজার জর্দানিয়ান দিনার খরচ করে এটির অনেক অংশ নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে অনেক সৌদি ঠিকাদারও নির্মাণ ও সংস্কারকাজ করেছিলেন। তবে ১৯৬৭ সালে ইহুদিরা পুরো জেরুজালেম দখল করে এবং নির্মাণ ও মেরামতের কাজে বাধা দেয়। আল-আকসা মসজিদ ধ্বংস করার লক্ষ্যে এটির চারপাশে গর্ত ও পরিখা খননের কাজ শুরু হয়। তারপর ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে ইহুদিরা আল-আকসা মসজিদে আগুন দেয়, যা মসজিদের ব্যাপক ক্ষতি করে, মিম্বর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মসজিদের দক্ষিণ অংশ, যেখানে উমর (রা.) মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সেটিও পুড়ে যায়।

ফিলিস্তিনে ক্রুসেডার শাসন

জেরুজালেমকে ঘিরে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধসমূহ ক্রুসেড হিসেবে পরিচিত। আজকের এই দিনে অর্থাৎ ১৫ জুলাই ১০৯৯ খিস্টাব্দে ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাদের আয়ত্তে নেয়। যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাস জেরুজালেমের প্রাণকেন্দ্র। বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে আসা মানেই জেরুজালেম হাতের মুঠোয় নেওয়া।

জেরুজালেমকে মূলত মুসলমান, খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের পবিত্র স্থান বলে মনে করা হয়। সেখানে মুসলমানদের পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস, ইহুদিদের পবিত্র টেম্পল মাউন্ট এবং খ্রিস্টানদের পবিত্র গির্জা অবস্থিত। বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং এখান থেকেই মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) প্রথম মেরাজে যান। এই জেরুজালেমেই খ্রিস্টানদের পিতা যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়।

ইউরোপে মুসলিম বিদ্বেষিতা নতুন কিছু নয়। মধ্যযুগ থেকে এর সূত্রপাত। মধ্যযুগে খ্রিষ্টানদের কাছে জেরুজালেম শহরটি ছিল তাদের ধর্মীয় প্রেরণার প্রধান কেন্দ্র। তাদের বিশ্বাস, এখানেই যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যু হয়েছিল এবং সমাহিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের কাছে জেরুজালেম তৃতীয় পবিত্র নগরী, যেখান থেকে ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) আরশে আজিমে যাত্রা করেছিলেন বলে ইসলাম ধর্মের বিবরণে উল্লেখ করা আছে। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা জেরুজালেম জয় করেন। এই শহরের 'ডোম অব দ্য রক' এবং 'আল-আকসা মসজিদ' মুসলমানদের কাছে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থান।

১০৯৫ সালে ফ্রান্সের একটি ছোট্ট শহর ক্লেরমন্টে পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে জেরুজালেম উদ্ধারের নামে প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি থেকে প্রায় ৭৫ হাজার খ্রিষ্টান যোদ্ধা প্রথম ক্রুসেডে অংশ নিয়েছিল। ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই দীর্ঘ

অবরোধের পর ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে। এর মধ্য দিয়ে কুদসে মুসলমানদের ৪৬২ বছরের শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। তার পর দীর্ঘ ৮২ বছর এটি খ্রিষ্টানদের দখলে থাকে।

তেরশ শতকে ইরাকি ইতিহাসবিদ ইবন আল-আসিরের মতে, সেই সময় জেরুজালেমে ৭০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদিদের ধর্মীয় স্থাপনা ‘সিনাগগ’-এ যেসব ইহুদি ধর্মাবলম্বী লুকিয়ে ছিল তাদেরও হত্যা করেছিল ক্রুসেডাররা। কারণ, তখনকার ইহুদিরা ছিল মুসলমানদের পক্ষে।

জেরুজালেম হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য ছিল বড় একটি আঘাত। ফলে মুসলমানরাও সংগঠিত হতে শুরু করে। এগারোশ চুয়াল্লিশ খ্রিষ্টাব্দে মসুলের (বর্তমান ইরাকের একটি প্রদেশ) গভর্নর সেলজুক নেতা নু ুরুদ্দিন জঙ্গির নেতৃত্বে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমানরা ‘জিহাদ’-এর ডাক দেয়। নূরউদ্দিন আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে ইমাদউদ্দিন জঙ্গি ছিলেন তুর্কি বংশো™ ূতে জঙ্গি রাজবংশীয় শাসক। ১১৪৬ থেকে ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশ শাসন করেছেন। তাকে দ্বিতীয় ক্রুসেডের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর বাবা ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন এবং আততায়ী এক ক্রুসেডারের হাতে তিনি নিহত হন।

বাবার হত্যাকাণ্ডের পর নূর উদ্দিন ও বড় ভাই সাইফ উদ্দিন নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেন। মসুলের দায়িত্ব পান বড় ভাই সাইফুদ্দিন জঙ্গি আর আলেপ্পোর (বর্তমানে সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ) দায়িত্ব পান নুরুদ্দিন জঙ্গি নিজে। সাইফুদ্দিন ইন্তেকাল করলে সমগ্র সাম্রাজ্যের ভার তার কাঁধে অর্পিত হয়। নুরুদ্দিন জঙ্গি নিজেকে তাঁর বাবার যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পিতা অপেক্ষা ভয়ংকর হিসেবে আভির্ভূত হয়েছিলেন। তার নেতৃত্বে বায়তুল মোকাদ্দাস পুনর্দখলের তৎপরতার খবরে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার পর ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইস এবং জার্মানির রাজা তৃতীয় কনরাডের নেতৃত্বে দুটি খ্রিষ্টান বাহিনী দ্বিতীয় ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

১১৪৭ সালে রাজা লুইস এবং কনরাডের বাহিনী জেরুজালেমে সমবেত হলে নুরুদ্দিন জঙ্গি সহায়তা চান দামেস্কের শাসকের। ‘ব্যাটল অব ইনায়ে’ যৌথ মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডার বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। জেরুজালেম চত্বরসহ শহরের অলি-গলি ক্রুসেডারদের রক্ত রঞ্জিত হয়। ফোরাত এবং নীল নদের মধ্যবর্তী সব মুসলমানকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করে রাখার নিরন্তর প্রয়াস ছিল নূর উদ্দিনের। মিসর জয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এক করা ও বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত করাই ছিল নূর উদ্দিনের স্বপ্ন, যা অর্জনের জন্য সারা জীবন তিনি জিহাদ করে গেছেন।

পরবর্তী সময়ে তাঁর এই স্বপ্ন প্রিয় সাগরেদ সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী সমাপন করেছিলেন। ক্রুসেডাররা নুরুদ্দিন জঙ্গিকে সম্মুখ সমরে হটাতে না পেরে গোপনে খাদ্যে বিষাক্ত স্লো-পয়োজন

প্রয়োগ করে, যাতে তিনি অসুস্থ হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। তিনিই ছিলেন জেরুজালেম বিজেতা ও ক্রুসেডরদের দাম্ভিক মস্তিস্ক চূর্ণকারী সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর অভিভাবক, তিনিই আইয়ুবীকে জিহাদের ময়দানে এনেছেন। এছাড়া তিনি নবীজির লাশ মুবারক চুরির ইয়াহুদি চক্রান্তকে দৃঢ়ভাবে নস্যাত করে সেই ইহুদিদের কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। অবশেষে রাসুল (সা.) এর রওজা মুবারককে অনেক নিচ পর্যন্ত সিসা দ্বারা ঢালাই করে দেন। এছাড়া ইসলামের কল্যাণ ও জনহিতকর অসংখ্য কাজের অমর স্মৃতি রয়েছে তার।

নুরুদ্দিন জঙ্গির নেতৃত্বাধীন মুসলিম যৌথ বাহিনীর কাছে ক্রুসেডারদের করুণ পরিণতি খ্রিষ্টান জগতে মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ১১৮৭ সালে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য তখনকার পোপ অষ্টম গ্রেগরি তৃতীয় ক্রুসেডের ঘোষণা দেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড (রিচার্ড দ্যা লায়নহার্ট নামে পরিচিত) নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তৃতীয় ক্রুসেডে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

ক্রুসেডের ইতিহাসে সালাউদ্দিন আইয়ুবী এক কিংবদন্তি। বীর সালাউদ্দিন আইয়ুবীর কথা শুনেননি এমন মানুষ কমই আছেন। শুধু মুসলিম ইতিহাস নয়, শত্রুর কাছেও তিনি ছিলেন সম্মানিত এক বীর। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মেসোপটেমিয়ার তিকরিতে (বর্তমান ইরাকের প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম আরব, তুর্কি ও কুর্দি সংস্কৃতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস যেখানেই সুলতান সালাহউদ্দিনের নাম উচ্চারণ করেছে, সঙ্গে আবশ্যিকভাবে আলোচিত হয়েছে প্রতিপক্ষের সেনাপতি রিচার্ড লায়নহার্টের নাম। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের ছত্রে ছত্রে এ দুটি নাম লেপ্টে আছে বীর বিক্রমে। ক্রুসেডের ময়দানগুলোতে এই দুই বীর পুরুষের মধ্যকার পৌরুষদীপ্ত ভূমিকার কথা আরব-অনারবের সব সচেতন ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

সালাউদ্দীন আইয়ুবীর আল-আকসা জয়

আবু নাসির সালাহুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব। যিনি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নামে প্রসিদ্ধ। মিশর ও সিরিয়ার প্রথম সুলতান ও আইয়ুবীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অমুসলিমদের মাঝে তিনি সালাদিন বলে পরিচিত। শামে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। তার সালতানাতে মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইয়ুবি ১১৩৭ সালে ইরাকের তিকরি নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের গর্বিত এক সেনানায়ক। মুসলমানদের প্রথম কিবলা, অসংখ্য নবী-রাসুল,

সাহাবি ও তাবেয়িদের স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিনের আল-আকসা জয় করেন। ১১৮৭ সালের ৪ এপ্রিল সংঘটিত হিত্তিনের যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন।
এ যুদ্ধে অনেক ইহুদি সেনা নিহত হওয়ায় ক্রুসেডাররা মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। দুর্বল হয়ে পড়ে সৈন্যদের মনোবল। আর আসকালান ও গাজা চলে আসে মুসলমানদের কব্জায়। প্রিয় আকসা বিজয়ের লক্ষ্যেই মুসলিম বাহিনী বীরদর্পে লড়ছিলো। হিত্তিনের যুদ্ধ আল-আকসা বিজয়ের পথকে সুগম করে দেয়

যুদ্ধের সূচনা

সালাহউদ্দীন আইয়ুবি রহ. জামালুদ্দিন শারবিন বিন হাসান রাজির নেতৃত্বে জেরুজালেম শহরের উপকণ্ঠে প্রেরণ করেন একদল জানবাজ মুজাহিদ। যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই মুসলমানদের ওপর ক্রুসেডাররা অতর্কিত আক্রমণ করলে সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আমির জামালুদ্দিনসহ আরো অনেক মুজাহিদ শহীদ হন।

সালাহউদ্দীন আইয়ুবি রহ. এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। শহরে চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দুর্গ রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর মিনজানিকের গোলাবর্ষণ শুরু করেন তিনি। মুষলধারে তীরও বর্ষণ করেন। গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একদল জানবাজ মুজাহিদ সীমানা প্রাচীরের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তারা ১২ দিন জেরুজালেম অবরোধ করে রাখেন।

১১৮৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সবচেয়ে বড় বাধা অতিক্রম করে নগরের প্রাচীরের ওপর ইসলামি বাহিনী চড়তে সক্ষম হয়। নগর প্রাচীরে উঠেই মুজাহিদরা ইসলামি পতাকা উড্ডীন করেন। কালিমার পতাকা উড়তে দেখে নগর রক্ষাকারী বাহিনী এ কথা বিশ্বাস করে নেয় যে, আর মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

আসলে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। তবে তারা তাদের একগুঁয়েমি চালিয়েই যায়। লোকজন গীর্জায় জমা হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। পাপের কথা স্বীকার করে, নিজেদের পাথর দিয়ে বারবার আঘাত করতে থাকে এবং তারা আল্লাহর কাছে রহমতের আশা করতে থাকে। মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়া থেকে বাঁচতে প্রার্থনায় মগ্ন হয়।নারীরা বিভিন্নভাবে পুরুষদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এমনকি নারীরা তাদের মেয়েদের মাথার চুল পর্যন্ত কর্তন করে দেয়। কিন্তু ক্রুসেডাররা এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমান সৈন্যদলের ওপর আক্রমণ করলে তারা

নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়ার শঙ্কায় অস্ত্র ধরা থেকে বিরত থাকে। ২৬ রজব ৫৮৩ হিজরি ক্রুসেডাররা সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর কাছে নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করে।

আল আকসা বিজয়

২৭ রজব ৫৮৩ হিজরি শুক্রবার মুসলিম উম্মাহর একটি স্মরণীয় দিন। বর্বর ইহুদি ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল নবী-রাসুলদের পবিত্রভূমি ও আমাদের প্রথম কিবলা আল-আকসা; বাইতুল মুকাদ্দাস। এদিন নগরীর প্রাচীরে প্রাচীরে উড্ডীন করা হয় কালিমাখচিত পতাকা। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজেতা সালাহউদ্দীন আল আইয়ুবি রহ. মসজিদে প্রবেশ করে সর্ব প্রথম জুমার নামাজ আদায় করেন। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

ক্ষমা ঘোষণা

খ্রিষ্টানদের এমন দুঃসাহসিকতা ও লজ্জাজনক অবস্থানের পরেও সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক লেন পোল সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ.-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'খ্রিষ্টান পাদ্রীদের মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে মহানুভবতা শেখা উচিত।' (সালাহউদ্দীন ও ফিলিস্তিন পৃষ্ঠা ২১৬)।

ইতিহাসে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. ও অন্যান্য মুসলিম শাসকরা মহানুভবতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। দীর্ঘ ৯০ বছর পর ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমি মসজিদুল আকসায় তাকবির ধ্বনি উচ্চারিত হয়। কুব্বাতুস সাখরায় স্থাপন করা ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলা হয়। গির্জায় রূপান্তর করা মসজিদগুলোতে আবারও আজান ধ্বনিত হয়। মিম্বরগুলো সুন্দর জায়নামাজে সুসজ্জিত হয়।

ফিলিস্তিন পতনের সূচনা

প্রাচীন মিশরীয় যুগ থেকে শুরু করে ১৬ শতকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ, সাম্রাজ্য এবং ব্যক্তি গাজা উপত্যকাকে শাসন, ধ্বংস ও পুনরুদ্ধার করেছে। অঞ্চলটিকে ঘিরে রয়েছে চার হাজার বছরের অবরোধ এবং ভোগ দখলের দীর্ঘ ইতিহাস।

৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি অঞ্চল গাজা উপত্যকা যা ইসরাইল, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রায় ২৩ লাখ মানুষ বসবাস করে। যা বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে একটি।

গাজা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, এরপর এটি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ এবং তুর্কিরা গাজা উপত্যকা এবং অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ এশিয়ান আরব অঞ্চলগুলোর ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছায়।

তবে ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সময়, বিজয়ী ইউরোপীয় শক্তিগুলো প্রতিশ্রুত ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়।

বরং তারা বেশ কয়েকটি ম্যান্ডেট জারি করে যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যকে বিভক্ত করে সুরক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়। গাজা উপত্যকা ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অংশ থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব সদ্য গঠিত জাতিসংঘের ওপর ছেড়ে দেয়।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। যার মাধ্যমে, জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব পাস করে। ইহুদিদের জন্য ভূখণ্ডের ৫৫ শতাংশ, গাজা উপত্যকাসহ বাকি অংশ আরবদের জন্য বরাদ্দ করা হয়।তবে জেরুসালেম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি।

এই প্রস্তাবনার ফলে, ফিলিস্তিনের ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসান ঘটে এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এরপরই ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই সংঘাতের কারণে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি শরণার্থী গাজা উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের পর গাজা উপত্যকা মিশরের দখলে চলে যায় এবং তাদের দ্বারাই শাসিত হয়।

তবে সেই নিয়ন্ত্রণ থাকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। ওই বছর ইসরাইলের সাথে মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে ছয় দিনের যুদ্ধ শুরু হয়।

যুদ্ধে ইসরাইলি বাহিনী জয়লাভের পর গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়। এরপর থেকে ওই ভূখণ্ডের দখল নিয়ে একের পর এক সহিংস সংঘর্ষ শুরু হয় যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

ফিলিস্তিনের দুর্ভোগ জায়নিস্ট মুভমেন্ট

সম্প্রতি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি বক্তব্য গণমাধ্যমে চাউর হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি ইহুদী নই, তবে আমি জায়নিস্ট। জায়নিস্ট হওয়ার জন্য ইহুদী হওয়া জরুরি নয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর ২০২৩)

যদি সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট ছাড়া শুধু উদাহরণের মাধ্যমে জায়নবাদ বুঝতে হয়, তাহলে ফিলিস্তিনে প্রায় এক বছরের বশি সময় ধরে চলমান গণহত্যার দিকে তাকানোই যথেষ্ট। সহজেই জায়নবাদের রূপ ও স্বরূপ বুঝে আসবে।

জায়নবাদের আরবী নাম হল- الصَّهْيُوْنِيَّة (সাহয়ূনিয়্যা)। এটি ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। 'সাহয়ূন' জেরুজালেমে ইহুদীদের স্মৃতিবিজড়িত একটি পাহাড়। এর দিকে যুক্ত করে এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে সাহয়ূনিয়্যা। (দ্র. আসসাহয়ূনিয়্যা বি-ইজায, পৃ. ১৪)

এ আন্দোলনের মূলকথা, গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদেরকে একত্রিত করে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এখান থেকে গোটা দুনিয়ায় রাজত্ব করা হবে। (দ্র. মুজাযু তারীখিল ইয়াহুদ, পৃ. ২৭২)

জায়নবাদ তথা ইহুদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেক পুরোনো। অতীতে বিভিন্ন সময় ইহুদীরা ইহুদী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। তবে সংগঠিতভাবে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় ১৮৯৭ সাল থেকে। এ বছর ইহুদী সাংবাদিক থিওডর হার্জেলের (১৮৬০-১৯০৪ ঈ.) নেতৃত্বে সুইজারল্যান্ডের বাসল নগরীতে ইহুদীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের মালিকানাধীন কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা, কৃষি বসতি স্থাপন, বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়া, বিভিন্ন দেশের সরকারকে জায়নবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার প্রচেষ্টা ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (দ্র. আসসাহয়ূনিয়্যা বি-ইজায, পৃ. ১৬-১৭; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা, জায়নিযম)

এরপর ১৯১৭ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন ব্রিটিশ শাসনের করতলগত হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জায়নবাদী পরিকল্পনা আরেক ধাপ এগিয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৪৮ সালে ১৪ মে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন ত্যাগ করলে জায়নবাদীদের পরিকল্পনা পুরো বাস্তবায়িত হয় এবং ঐ বছরের ১৫ মে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান করে। (মুজাযু তারীখিল ইয়াহুদ, পৃ. ২৬৮-২৬৯)

এভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় মুসলিম বিশ্বে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল জন্ম লাভ করে। এই হল জায়নবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা।

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে, কোনো মুসলিম দেশে ইহুদী হিসাবে বসবাস করা এক কথা আর জায়নবাদী চিন্তা লালন করা এবং মুসলিমদের পবিত্র নগরী দখল করে নিজেদের জায়নবাদী চিন্তা বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখা ভিন্ন কথা।

কিন্তু জায়নবাদ ইহুদী ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম দেশে বসবাস করে মুসলমানদের পবিত্র নগরী দখল করা এবং সেখানে ইহুদী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখা- মুসলমানদের সাথে পরিষ্কার গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতা। সেই বিশ্বাসঘাতকতাই করছে জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল। একসময় যেই আরবরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল, আজকে তারাই সেই আরবদেরকে নিজ দেশে পরবাসী বা উদ্বাস্তু করে দিচ্ছে!

আজকাল জায়নবাদিরা প্রোপাগান্ডা চালায়- ফিলিস্তিন তাদের পিতৃভূমি। তাদের পিতৃপুরুষগণ এ এলাকা শাসন করেছেন। এই প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তারা মানুষের মনে তাদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করতে চায়। কিন্তু তাদের এ প্রোপাগান্ডার যুক্তিসঙ্গত কোনো ভিত্তি নেই। এটা ধর্মীয়ভাবেও প্রমাণিত নয়, ঐতিহাসিকভাবেও নয়।

যেই পূর্বপুরুষের কথা বলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে নিজেদের অধিকার দাবি করে, তারা আসলে সেই পূর্বপুরুষের কেমন সন্তান? তারা তো শত শত নবীকে হত্যা করেছে। তাওরাতকে বিকৃত করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের সাথে বেআদবী করা তাদের মজ্জাগত। যেই সুলাইমান আ.-এর দোহাই দিয়ে তারা বাইতুল মাকদিস ভেঙে কথিত হাইকালে সুলাইমানী (সুলাইমান আ. নির্মিত ইবাদতখানা) নির্মানের কথা বলে, তারা তো সেই সুলাইমান আ.-কে শুধু নবী নয়, একত্ববাদে বিশ্বাসী হিসেবেও গণ্য করে না। ইহুদীদের নিকট সুলাইমান আ. শেষ বয়সে মুরতাদ হয়ে যান, নাউযুবিল্লাহ। একথা তাদের বাইবেলে এখনো বিদ্যমান। [দ্র. বাইবেল, ১-বাদশানামা (১১) : ১-২১]

সবশেষে বলা যায়, জায়নবাদ মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে ইহুদী-খ্রিস্টানদের এক সম্মিলিত চক্রান্ত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, সবশেষে আল্লাহর বাণীই সত্য বলে প্রমাণিত হবে-

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللهُ وَ اللهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

কাফেররা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৫৪

ইহুদীরা যে কারনে ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র চায়

ইহুদীরা বিশ্বাস করে বাইবেলে বর্ণিত পিতৃপুরুষ আব্রাহাম এবং তার বংশধরদের জন্য যে পবিত্রভূমির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, আজকের আধুনিক ইসরায়েল সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই অবশ্য এই ভূমি নিয়ে সংঘাত চলছে। আসিরিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান, পার্সিয়ান, ম্যাসিডোনিয়ান এবং রোমানরা সেখানে অভিযান চালিয়েছে, সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। রোমানরা সেখানে 'জুডেয়া' বলে একটি প্রদেশ তৈরি করেছিল।

তবে এই 'জুডেয়া' প্রদেশের ইহুদীরা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করেছেন। রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের আমলে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট জাতীয়তাবাদী ইহুদী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। তিনি সে দমন করেন। এরপর তিনি জুডেয়া এবং রোমানদের অধীন সিরিয়াকে যুক্ত করে তৈরি করেন এক নতুন প্রদেশ, যার নাম দেয়া হয় সিরিয়া-প্যালেস্টাইন।

এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। সেখানে ইহুদীদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়। অনেকে নির্বাসিত হয়। অনেক ইহুদীতে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়।

ইহুদিদের ফিলিস্তিন দখল ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলেও তাদের ওপর মক্কার কুরাইশরা যে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছিল, তা সহজে বিস্মৃত হওয়ার মতো ছিল না। এ জন্য হুজুর (সা.) দারুণভাবে মর্মাহত ছিলেন। তা ছাড়া মদিনায় ইহুদিদের উপস্থিতিও কম বিপজ্জনক ছিল না। মদিনায় তখন তিনটি প্রধান ইহুদি গোত্র বসবাস করত। হুজুর (সা.) ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইহুদিদের সাথে একটি রাজনৈতিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে তিনটি ইহুদি গোত্র- বনি নজির, বনি কোরাইজা এবং বনি কায়নুকা সবারই স্বাক্ষর ছিল। এটি 'মিছাকে মদিনা' বা মদিনার সনদ নামে খ্যাত। মোট ৫২ দফা সংবলিত এই চুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদিদের অধিকার সংক্রান্ত ছিল।

চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়, চুক্তিভুক্ত সব পক্ষই তাদের নিজ নিজ মহল্লার শান্তি-নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবে। যুদ্ধ এবং সন্ধি উভয় অবস্থায় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখা হবে। বিবাদ-বিশৃঙ্খলাকারীদের কঠোর হাতে দমন করা হবে এবং কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে রাসুলের (সা.) সিদ্ধান্ত সবাইকে মেনে নিতে হবে। ইহুদিদের স্বার্থ ও অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোতে বলা হয়- তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হবে এবং তারা অঙ্গীকার করে, আক্রান্ত অবস্থায় ইহুদিরা মুসলমানদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। বিপক্ষের সাথে সন্ধি করার সময় তারা মুসলমানদের সঙ্গে থাকবে এবং কুরাইশদের কোনো প্রকার নিরাপত্তা প্রদান করবে না। ধারাসমূহে এ ধরনের আরো বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'সিরাতে ইবনে হিশাম'-এ বর্ণিত হয়েছে, ইহুদি গোত্র 'বনি কায়নুকা'র সাথে সন্ধি করার সময় রাসূল (সা.) তাদের শপথ প্রদানের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাওরাতে কি আমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নেই? যদি তোমরা শপথ করে বলো যে, 'নেই' তাহলে তোমাদের এ ব্যাপারে দোষারোপ করা হবে না।' সে যাই হোক, বনি কায়নুকার ইহুদিরা সম্পাদিত চুক্তিতে স্থির থাকতে পারেনি। তারা অচিরেই চুক্তি ভঙ্গ করে। যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কিছু খুনাখুনি হয়। পরিণতিতে

মুসলমানরা তাদের মহল্লা ঘেরাও করে ফেলেন এবং ১৫ দিন পর তারা শর্তহীনভাবে বশ্যতা স্বীকার করলে রাসুল (সা.) তাদের তিন দিনের মধ্যে নিরাপদে মদিনা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আটক করে রাখা হয়। কথিত আছে, ইহুদিরা শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বিতাড়িত ইহুদিদের সংখ্যা সাতশ ছিল বলে একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। হিজরি দ্বিতীয় সালের ১৫/১৬ শাওয়াল বনি কায়নুকার ইহুদিদের অবরোধ করা হয়। অত:পর মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। এটাই ছিল তাদের চুক্তি ভঙ্গের খেসারত।

ইহুদীদের দুশ্চরিত্রের কারণে কুচক্রী ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে রক্ষা করার গরজে ইউরোপ যখন মধ্যযুগে ইহুদী বিতাড়ন শুরু করে তখন আরবগণ তাদেরকে আবার আশ্রয় দিতে শুরু করে। যার ফলে হেজাজ ছাড়া অন্যান্য আরব দেশে কিছু ইহুদীদের আবাস স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ইহুদীরা অত্যাচার দ্বারা সারা আরব দেশ কাঁপিয়ে তোলে। তাদের অত্যাচার থেকে ইসলামী রাজ্যকে রক্ষা করার মানসে হযরত ওমরসহ প্রমুখ খলিফা হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই তাদেরকে দ্রুত আরবদের সীমানা হতে সরিয়ে দেন। এটাই ইহুদীদের ফিলিস্তিনে তথা আরবের সীমা হতে শেষ বারের মত বিদায়।

হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, কুটিলতা, হঠকারিতা, দাম্ভিকতা, অনমনীয়তা ও ষড়যন্ত্র ইহুদীদের জাতীয় বৈশিষ্ট। তাই এরা যখনই যে দেশে আশ্রয় নিয়েছে ইহুদীরা তাদের এ গুণাবলী দ্বারা তাদের আশ্রয় দেশকে নরকে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। ইহুদীদের এ সকল ঘৃণিত আচরণের ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপ ইহুদী বিতাড়নে বদ্ধপরিকর হন। পরবর্তী ইউরোপও মধ্যযুগীয় ইউরোপকে অনুসরণ করায় ইহুদীরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যান্ড, ইতালী, রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এরা চরম আঘাত পেয়েছে জার্মানীর হিটলারের পক্ষ থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীতে বসবাসকারী ইহুদীরা জার্মানীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সহযোগীতা করে। এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় ইহুদীদের উপর ব্যপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। ফলে ইহুদী চিন্তানায়কদের বুঝতে বাকি রইলনা যে তারা আর বেশিদিন ইউরোপে টিকে থাকতে পারবেনা। অতএব দ্রুত তাদের একটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমি আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে বর্তমান ইহুদীবাদ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

অষ্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক থিওডর হার্জল ইহুদীবাদকে নতুন প্রেরণা দান করেন। তারই প্রচেষ্টায় ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে সুইজারল্যান্ডের বেসেল-এ প্রথম ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আন্দোলনের একটি গঠনতন্ত্র রচিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে নিউইয়র্ক শহরে ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পেশ ও পাশ করা হয়। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ইংরেজদের আনন্দের সীমা রইলনা। তাদের একসঙ্গে দুটি সুযোগ জুটে গেল। এতে একদিকে ইউরোপ হতে ইহুদী আপদ দূরীভূত হবে, অপরদিকে এদের সাহায্যে তুর্কি শক্তিকে ধ্বংস করে পশ্চিম এশিয়াকে ইউরোপের কুক্ষিগত রাখার সুযোগ হবে। আসল মতলবকে

গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ আফ্রিকার উপত্যকাকেই ইহুদী আবাসে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে জিওনিষ্ট কমপ্লেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় ফিলিস্তিনের প্রস্তাবকে তারা জীবিত করেন।

ইংরেজদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুযোগ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ লরেন্স ষড়যন্ত্র দ্বারা মক্কার গভর্নর শরীফ হোসাইন ও সমগ্র আরব জাতিকে তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে সক্ষম হন। শরীফ হোসাইন বৃটিশের নিকট আরবের স্বাধীনতাসংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পেশ করেন। মিশরে নিযুক্ত বৃটিশ হাই কমিশনার আর্থার ম্যাকমোহন বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ হতে শরীফের সঙ্গে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত শর্ত মেনে নেন।

যুদ্ধ শেষে ইংরেজগণ আরবদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে আরবদেরকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবার ফন্দি আটতে লাগল। জাতিসংঘে এজন্যই ম্যান্ডেট প্রথা উদ্ভাবিত হল। ১৯১৯ সালের ২৮শে এপ্রিল ম্যান্ডেট আইন পাশ হলে সমগ্র আরব নিয়ে যেখানে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল সেখানে তাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হল। যার পরিণতিতে ফিলিস্তিন ইংরেজদের কবলে আসল। তখন ইংরেজগণ ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর তৎকালিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেলফোর কৃত ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করতে লাগল। ইংরেজদের সাহায্যে চারদিক থেকে ইহুদী এসে ফিলিস্তিনে ভীড় জমাতে লাগল।১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইহুদীরা চার লক্ষ একর জমি অর্থাৎ ফিলিস্তিনের মোট ভূমির অর্ধেকের বেশি দখল করে নিল।

১৯৪৫ সালে আরবলীগ গঠিত হলে ফিলিস্তিন সমস্যা আরবলীগের কর্মসূচীতে বিশেষ স্থান লাভ করে। ফিলিস্তিনের প্রতি সংঘবদ্ধ আরব রাষ্ট্রসমূহের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে ইংরেজগণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান কল্পে ১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে এক ইঙ্গ মার্কিন কমিশন নিযুক্ত করে। ১৯৪৬ সালের ৩০ শে এপ্রিল উক্ত কমিটি ইহুদীদের পক্ষে ওকালতী করে এক রিপোর্ট পেশ করে। আরবগণ উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে জেহাদের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে।

১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে পুনরায় একজন বৃটিশ হাইকমিশনারের অধীনে ফিলিস্তিনকে আরব ইহুদী দুই প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী দুই পক্ষই তা প্রত্যাখ্যান করে।

বৃটিশের এই শেষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পর বৃটিশ গভর্নমেন্ট এ বিষয়টিকে সম্মিলিত জাতীয় পরিষদে পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় পরিষদ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। উক্ত কমিটি ফিলিস্তিনকে তিন ভাগে বিভক্ত করে কতক স্থান নিয়ে আরব রাষ্ট্র, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে ইহুদী রাষ্ট্র গঠন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলো জাতীয় পরিষদের তত্বাবধানে থাকার প্রস্তাব করে। ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর জাতিপুঞ্জের সুপারিশ অনুযায়ী ফিলিস্তিন বিভাগের চুড়ান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু আরব লীগ এ ঘোষণার

বিরোধিতা করে। জাতিপুঞ্জ স্বীয় ঘোষণাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি ফিলিস্তিনে পাঠায়। কিন্তু কমিটি তাতে ব্যর্থ হয়। বৃটিশ ইহুদীদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও জনসংখ্যায় শক্তিশালী করে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে ফিলিস্তিন ত্যাগ করে। ঐ তারিখেই ইহুদীরা ইসরাইল রাষ্ট্র স্থাপনের ঘোষণা প্রচার করে। তেলআবিব উহাদের রাজধানী এবং ওয়াজমেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইসরাইল ঘোষণার পরপরই আমেরিকা তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

এ ভাবেই অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা ইসলামের শত্রুদের সাহায্য সহায়তায় মুসলিম জাহানের মধ্যে নিজেদের রাষ্ট্র পাকাপোক্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

সুদূর অতীতে তিন শতাব্দী ধরে একটি নয়, দুটি নয়, আটটি ক্রুসেডের মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিল ভাগ্যচক্রে সেই জেরুজালেম যখন তাদের দখলে এসেছে তখন কি তারা অতি সহজে শুধুমাত্র আলোচনা ও দাবীর কারণে তা মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দেবে? না, দেবে না।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ভূমি দখলের মধ্য দিয়ে বিশ্বে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। আর সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স ইসরাইলকে স্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নৃশংস ইহুদী জাতির মনোবল বেড়ে যায় এবং তারা ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে নিরীহ মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে প্রায় দশ লক্ষ মুসলমানকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে। যে কারণে বাধ্য হয়ে মিসর, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডানকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়। এতে ইহুদীদের মদদ দাতা দেশগুলো জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি পাশ করায়ে ইহুদেরকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে।

পশ্চিমা দেশগুলো এত বিপুল পরিমান অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইসরাইলকে সমৃদ্ধ করেছে যেন তার চারপাশে সমুদয় মুসলিম দেশ একত্রে সমবেতভাবে যুদ্ধে নামলেও তার সাথে এঁটে উঠতে না পারে। যার পরিণতিতে দেখা গেল যে, ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল মিসরের নিকট থেকে গাজা ও সিনাই মরুভুমি, সিরিয়ার গোলান মালভূমি এবং জর্ডানের পশ্চিম তীর জোরপূর্বক দখল করে নেয়।

সমপ্রতি প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রস্তাবে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনীদের কাছে তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। এখানেই শেষ নয়, সমপ্রতি ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলীয় নেজেব মরুভূমি এলাকা থেকে ৫০ হাজার ফিলিস্তিনীকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেছে ইসরাইল। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যহত না রাখলে ইসলামের প্রথম কেবলা এবং লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বরের আগমনস্থল পবিত্র ভুমিকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি বর্বরতা

ইহুদীরা ফিলিস্তিনে অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চলছে ফিলিস্তিনিদের রক্তঝরা সংগ্রাম। চলছেই তাদের উপর বর্বরতা, যা হার মানায় অন্য সব বর্বরতার চিত্র। গনহত্যা যেন এক রেগুলার চিত্রে পরিণত হয়েছে, আর গাজা! এ এ যেন এক মৃত্যুপুরী। অবৈধ ইহুদীরা ফুলের মতো নিষ্পাপ হাজারো শিশুকে মারছে পাখির মতো করে,এতে যেন তারা পায় পৈশাচিক আনন্দ। ঠিক কবে হবে এর শেষ, বা কবে আসবে আবারো বিজয় সালাউদ্দিন আইয়ুবীর হাত ধরে তা রাব্বে কারীমই একমাত্র ভালো জানেন।

জায়নিস্ট মুভমেন্ট একটা অভিশপ্ত মুভমেন্ট ফিলিস্তিন বাসির জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে চলা গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে গনহত্যার চিত্র যেন শিহরন জায়গা। শিশু এবং নারীরা হচ্ছে এই গনহত্যার শিকান বেশি। **ইসরাইলের বর্বর হামলায় ফিলিস্তিন ও লেবাননে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন মানুষ। গত বছরের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই হামলায় ফিলিস্তিনেই নিহতের সংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজার। আহতের সংখ্যাটাও লাখ পেরিয়েছে। আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরাইলের চলমান হামলায় এ পর্যন্ত গাজায় ৪৩ হাজার ৯৭২ জন নিহত হয়েছেন। আর আহত হয়েছেন এক লাখ ৪ হাজার ৮ জন।**

গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে গাজার ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের নজিরবিহীন হামলার মধ্য দিয়ে গাজা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর থেকে টানা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এই সংঘাতের ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজার মানুষ।

ইসরাইলের অবিরাম হামলায় ফিলিস্তিনি ছিটমহলটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। হামলার প্রায় সাড়ে ১৩ মাস হতে চললেও এখন পর্যন্ত যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো প্রতিদিন শোনা গেছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও মৃত্যুর খবর। দিন দিন এই গনহত্যার শিকার হচ্ছে অসংখ্য মানুষ।

হামাস

হামাস অর্থ:

হামাস (আরবি: حماس) শব্দের অর্থ আশা, বা উদ্দীপনা। এটি মূলত الاسلامية حركة المقاومة হারাকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া, "ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন" এর একটি আদ্যক্ষর।ইজ্জদ্দীন আল কাসাম নামে হামাসের একটি সামরিক শাখাও রয়েছে। গাজা এবং পশ্চিম তীরে ইসলামি এই প্রতিরোধ আন্দোলন এর প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৮৭ সালে, প্রথম ইন্তিফাদা'র মাধ্যমে।

হামাস এর প্রতিষ্ঠাতা:

হামাস এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শেখ আহমেদ ইয়াসিন, যিনি মূলত ছিলেন তৎকালীন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ফিলিস্তিন শাখার নেতা। ইয়াসিন ছিলেন পঙ্গু কিন্তু তবুও যুবক বয়স থেকেই তিনি ছিলেন গাজার নেতা। ১৯৭৮ সালে ৪৯ বছর বয়সী শেখ আহমেদ ইয়াসিন ফিলিস্তিনিদের সাহায্যের জন্য আল মুজাম্মা আল ইসলামি নামে একটি ইসলামি সংগঠন গড়ে তুলতে অধিকৃত ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন।ইসরায়েল তা মনজুর করে, কেননা ইজরাইলের লক্ষ্য ছিল গাজায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা পিএলও এর গুরুত্ব হ্রাস করা। কিন্তু ইজরাইলের সেই প্রচেষ্টা বুমেরাং হয়ে যায় । খুব সহসাই তারা বুঝতে পারে শেখ আহমেদ ইয়াসিন বিচক্ষণ এবং পাক্কা মুসলমান। ইজরায়েলের মাথায় তাল রেখে কায়দা মত ঠিকই হামাসকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। ১৯৮৮ সালে গৃহীত হয় "হামাস চার্টার" যার লক্ষ্য হলো অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো

সংগঠন হিসেবে হামাস মূলত তিনটি শাখার সমষ্টি: রাজনৈতিক শাখা, সমাজকল্যাণমূলক শাখা এবং সামরিক শাখা। মজলিশে শূরা হামাসের প্রতিনিধিদের মিলনস্থল, যার মাধ্যমে হামাস সমগ্র ফিলিস্তিনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তবে হামাসের নীতিনির্ধারণী পরিষদ হলো পনেরো সদস্যের "পলিটিক্যাল ব্যুরো"।

হামাস প্রধান:

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যার বছরব্যাপী মিশন গত বুধবার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে ইসরায়েল। এক বছরের কিছু সময় আগে, ৭ অক্টোবর ২০২৩, দেশটিতে হামাসের নজিরবিহীন হামলার মাস্টারমাইন্ড, তথা মূল পরিকল্পনাকারী সিনওয়ার ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

আগে ইসমাইল হানিয়া, পরে সিনওয়ার—পরপর দুই শীর্ষ নেতাকে হারানোর ঘটনা হামাসের জন্য এক বড় আঘাত। তবে এতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, সংগঠনটি দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে। হামাস এরই মধ্যে অঙ্গীকার করেছে তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। বলেছে, সিনওয়ারসহ শীর্ষ নেতাদের এভাবে মেরে ফেলার অর্থ এই নয়, তাদের আন্দোলন–সংগ্রাম শেষ।

হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয় এক বিবৃতিতে সিনওয়ারের নিহত হওয়ার ঘটনা নিশ্চিত করে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'হামাস প্রতিবারই আরও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়েছে। মুক্ত ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার পথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যাত্রা অব্যাহত রাখতে এই নেতারা একেকজন আদর্শ হয়ে রইবেন।'

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যুর পর হামাসের নতুন দায়িত্বে আসছেন আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য খালেদ মেশাল।

খালেদ মেশাল 'আবু আল-ওয়ালিদ' ১৯৫৬ সালে সিলওয়াদের পশ্চিম তীরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারসহ কুয়েতে চলে যাওয়ার আগে তিনি সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর কুয়েতে যাওয়ার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন।

১৯৯৬ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে তিনি হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সভাপতির দায়িত্ব নেন এবং ২০০৪ সালে শেখ আহমেদ ইয়াসিনের মৃত্যুর পর এর নেতা নিযুক্ত হন।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ১৯৯৭ সালে মেশালকে হত্যার জন্য গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের প্রধানকে নির্দেশ দেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলেছিলেন।

মোসাদের ১০ এজেন্ট কানাডার জাল পাসপোর্ট নিয়ে জর্ডানে প্রবেশ করে সেই সময়ে জর্ডানের নাগরিক খালেদ মেশালকে রাজধানী আম্মানের একটি রাস্তায় হাঁটার সময় বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

জর্ডানের কর্তৃপক্ষ হত্যা প্রচেষ্টার সন্ধান পায় এবং জড়িত দুই মোসাদ সদস্যকে গ্রেফতার করে। জর্ডানের প্রয়াত রাজা হুসেইন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেশালকে যে বিষাক্ত পদার্থের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিষেধক চান, কিন্তু নেতানিয়াহু প্রথমে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের হস্তক্ষেপে নেতানিয়াহুকে প্রতিষেধক সরবরাহ করতে বাধ্য করায় এই হত্যা প্রচেষ্টা একটি রাজনৈতিক মাত্রা নেয়।

মেশাল ২০১২ সালের সাত ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো গাজা উপত্যকায় যান। ১১ বছর বয়সে তিনি চলে যাওয়ার পর ফিলিস্তিনি অঞ্চলে এটাই তার প্রথম সফর ছিল। রাফাহ ক্রসিংয়ে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন দল ও জাতীয় পর্যায়ের ফিলিস্তিনি নেতারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং গাজা শহরে পৌঁছনো পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের তাকে অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তার ধারে ভিড় করে।

২০১৭ সালের ৬ মে আন্দোলনের শুরা কাউন্সিল ইসমাইল হানিয়াহকে রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করে।

শিক্ষা :

টানা আট বছর অবরোধ এবং নানা ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও গাজা উপত্যকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে হামাস।২০১২ সালের হিসাব মতে, গাজা উপত্যকায় শিক্ষার হার প্রায় ৯৯%। সেখানে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া প্রায় চার লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৬৮৩ টি স্কুল রয়েছে যার মধ্যে ৩৮৩ টি স্কুল সরকার অর্থাৎ হামাস পরিচালনা করে।স্বাস্থ্য সেবাঃস্বাস্থ্যসেবায় হামাস নিজেকে নিয়ে গিয়েছে এক অনন্য অবস্থানে। অব্যাহত অবরোধে থাকবার কারণে খাদ্যের

মান কমে যাওয়ায় গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শৈশবকালীন অপুষ্টির হার মারাত্মক হারে বেশি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েলি আগ্রাসনে আহত মানুষজনের চিকিৎসা প্রয়োজন তো রয়েছেই। হামাস পরিচালিত হাসপাতালে কম খরচে বা বিনা খরচে সুচিকিৎসা দেয়া হয়। মৃত্যু উপত্যকা গাজায় বর্তমান জন্মহার প্রায় ৪%।

এছাড়াও শিশুদের জন্য অসংখ্য নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে হামাস। যার মাধ্যমে তাদের এক বেলা খাবারও সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা বা দাতা দেশ থেকে আসা সাহায্য ও আর্থিক অনুদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে হামাস; অপরপক্ষে ফাতাহ গোষ্ঠী এই দিকে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জ। হামাসের এই সামাজিক কার্যক্রমের জনপ্রয়তা শুধু গাজা স্ট্রিপেই নয়, বরং ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীর এমনকি আশেপাশের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও অনেক বেশি জনপ্রিয়।

মিডিয়া:

২০০৬ সাল থেকে হামাস চালু করেছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ‘আল আকসা টিভি’।হামাসের মিডিয়া গুরু ফাতহি হাম্মাদের মিডিয়া হাউজ ‘আর-রিবাত কমিউনিকেশন্স’ এর নেতৃত্বে আরও রয়েছে নিজস্ব রেডিও স্টেশন ‘ভয়েস অফ আল আকসা’ এবং সংবাদ পত্রিকা ‘দ্য মেসেজ’। অনলাইন জগতে টুইটার এবং ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে রয়েছে হামাসের সরব উপস্থিতি। এছাড়া লন্ডন থেকে আল ফাতিহ নামে শিশু-কিশোরদের জন্যেও একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিত বের করে।

সামরিক শাখা:

হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জদ্দিন আল ক্বাসাম ব্রিগেড যাকে সংক্ষেপে আল ক্বাসাম ব্রিগেড বলা হয়। এটি **১৯৯১** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তখন থেকেই ইসরায়েলকে সামরিকভাবে তটস্থ করে রেখেছে তারা। সীমিত সাধ্যের মধ্যেও লিমিটেড টেকনোলজী আর অর্থায়নে ক্বাসাম রকেট দিয়েই ইসরায়েলি বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের আয়রন ডোম অ্যান্টিমিসাইল সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ইসরায়েলের প্যাট্রিয়ট মিসাইল এবং এফ-১৬ এর মোকাবেলায় ক্বাসাম ব্রিগেডের ব্যবহার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে স্বল্প মাত্রার আল বানা, আল বাতার এবং আল ইয়াসিন রকেট, এছাড়াও ট্যাংক বিধ্বংসী গোলাসহ কিছু হালকা যুদ্ধাস্ত্র।সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরের তলদেশ দিয়ে ইসরায়েলে পৌছে এক দুঃসাহসিক কমান্ডো অভিযানের চেষ্টা চালায় হামাস যোদ্ধারা। ইরানের পর মুসলিম দেশ হিসেবে সাফল্যজনকভাবে ড্রোন তৈরি করতেও সক্ষম হয়েছে হামাস, যা তেলাবিবের আকাশ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে। তবে হামাস যোদ্ধারা গ্রাউন্ড কমব্যাটে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত। প্রবাসী হামাস নেতা খালিদ মিশালকে হত্যার একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং সিনবেথ, তবে হামাসের অপারেটিভদের সাহস এবং দৃঢ়তায় তারা সফল হতে পারে নি।দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সীমাহীন আত্মত্যাগ, সততা – দক্ষতা ও নিপীড়িত মানুষের মধ্যে থেকে তাদের

পাশে দাড়ানোর পাশাপাশি তাদের জন্য আমরণ লড়াইয়ের অদম্য মানসিকতাই হামাসকে দাঁড় করিয়েছে এক অনন্য অবস্থানে; শুধু ফিলিস্তিনিদের হৃদয়ে নয় বরং সারা বিশ্বের মজলুম সংগ্রামী মানুষের মধ্যে। আসুন আমরা ফিলিস্তিনের মর্দে মুজাহিদ হামাসের ভাইদের জন্য আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলি।

৭ অক্টোবরের হামলা:

২০২৩ ৭ অক্টোবর আচমকা হামলা চালিয়ে ইসরায়েলকে পুরোপুরি চমকে দিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। আকাশ, জল, স্থল- তিন পথ দিয়ে একযোগে হামলা চালায় সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। এতে এ পর্যন্ত ৩০০ ইসরায়েলি প্রাণ হারিয়েছেন। জবাবে, গাজায় পাল্টা হামলা চালিয়ে প্রায় ২৫০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। তবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে হামাস।

যেভাবে শুরু হলো 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড'

ভোর ৬টা ৩০ মিনিট: রকেট হামলাস্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৬টার দিকে ইসরায়েলের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে রকেট ছুড়তে শুরু করে হামাস। এর ফলে তেল আবিবের মতো দূরবর্তী শহরগুলোতেও বেজে ওঠে সতর্কতা সাইরেন।

হামাস জানিয়েছে, প্রথম ধাপে তারা পাঁচ হাজার রকেট ছুড়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী অবশ্য দাবি করেছে, ২ হাজার ৫০০ রকেট ছুড়েছে হামাস।

হামাসের রকেট হামলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলিরা বড় বড় ভবনগুলোর আড়ালে আশ্রয় নেয়। রকেটের আঘাতে অন্তত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেডের প্রধান মোহাম্মদ দেইফ বলেন, অপারেশন আল-আকসা ফ্লাডের শুরুতে শত্রুদের অবস্থান, বিমানবন্দর এবং সামরিক দুর্গগুলোকে লক্ষ্য করে পাঁচ হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা ছোড়া হয়েছে।

সকালে ৭টা ৪০: অনুপ্রবেশভোরের রকেট হামলা ছিল মূলত ইসরায়েলি বাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। এর আড়ালেই নজিরবিহীনভাবে বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র হামাস যোদ্ধা সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলের ভেতরে প্রবেশ করে।বেশিরভাগ যোদ্ধা গাজা ও ইসরায়েলকে বিচ্ছিন্নকারী নিরাপত্তা বেড়া ছিন্ন করে প্রবেশ করে। তবে অন্তত একজন হামাস যোদ্ধাকে প্যারাসুটের সাহায্যে উড়তে দেখা গেছে। এছাড়া, যোদ্ধাদের বহনকারী একটি মোটরবোটকে ইসরায়েলের উপকূলীয় শহর জিকিমের দিকে যেতে দেখা গেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ধাতব ব্যারিয়ারের ছিদ্র দিয়ে অন্তত ছয়টি মোটরসাইকেল নিয়ে ইসরায়েলে প্রবেশ করছেন ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা। হামাসের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, ইসরায়েলিদের বসানো সীমান্তবেড়ার একটি অংশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সকাল ৯টা ৪৫: ইসরায়েলি হামলাস্থানীয় সময় সকাল পৌনে ১০টার দিকে গাজা উপত্যকায় বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। এর কয়েক মিনিট পরেই ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জানান, গাজায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

সকাল ১০টা: ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটিতে হামলাসকাল ১০টায় ইসরায়েলের অন্তত তিনটি সামরিক স্থাপনায় প্রবেশ করেন ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা। সেগুলো হলো বেইত হ্যানউন সীমান্ত ক্রসিং, জিকিম ঘাঁটি এবং গাজা বিভাগের সদর দপ্তর রেইম।

হামাসের শেয়ার করা ভিডিওতে যোদ্ধাদের একটি জ্বলন্ত বিল্ডিংয়ের দিকে দৌড়াতে দেখা গেছে।এরপরে বেশ কিছু ইসরায়েলি সামরিক যান গাজায় নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে প্যারেড করাতে দেখা যায় হামাস যোদ্ধাদের।

সীমান্ত শহরে হানাফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ইসরায়েলি শহর সেডেরট, বেইরি এবং ওফাকিম শহরে হামলা চালিয়েছে বলে জানায় ইসরায়েলি মিডিয়া।এসময় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার পরামর্শ দেয় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।তবে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হামাস যোদ্ধারা ঢুকে পড়া এলাকাগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে ব্যর্থ হয় ইসরায়েল।

অপহরণ ও জিম্মিইসরায়েলি মিডিয়ার খবর অনুসারে, ওফাকিমে বন্দুকধারীরা বেশ কিছু ইসরায়েলিকে জিম্মি করে। ফিলিস্তিনি ইসলামী জিহাদের দাবি, তারা ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তাদের বন্দি করেছে।এছাড়া হামাসের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রকাশিত ফুটেজে দেখানো হয়েছে, ইসরায়েলি বন্দিদের গাজায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাতভর লড়াইশনিবার রাতভর গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তেমনি হামাসও ইসরায়েলের দক্ষিণ অংশে রকেট হামলা চালিয়েছে।গাজা উপত্যকার কাছে অন্তত ২২টি স্থানে হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে ইসরায়েলিদের লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে।

হতাহতের সংখ্যারোববার সকাল পর্যন্ত হামাসের হামলায় ইসরায়েলে মৃতের সংখ্যা ৩০০ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি মিডিয়া। আহত হয়েছেন অন্তত ১ হাজার ৫৯০ জন। এদের মধ্যে ৩০০ জনের অবস্থা গুরুতর।আর গাজায় ইসরায়েলিদের পাল্টা হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৩২ ফিলিস্তিনি। আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৯৭ জনে। স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।(তথ্য সূত্র : আল জাজিরা)

ইসরায়েলে কেন হামলা করল হামাস:

আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রবেশ এবং দখল করা জমিতে ইহুদি বসতি নির্মাণকে হামলার কারণ হিসেবে জানিয়েছে হামাস। এই হামলা আকস্মিক হলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না।

মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি—তিনি ধর্মের মানুষই আল-আকসা কমপাউন্ডকে পবিত্র মনে করে। এই মসজিদে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ইহুদিদের প্রবেশ করাকে কেন্দ্র করে বহুবার সংঘাতে

জড়িয়েছে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন। এ ধরনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালে ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে ১১ দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়েছিল হামাস। সাম্প্রতিক সময়ে উগ্র ইসরায়েলি জাতীয়তাবাদীরা ঘন ঘন আল-আকসা কমপাউন্ড পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন।

গত সপ্তাহে ইহুদিদের ফসল তোলার উৎসব 'সুকত'-কে কেন্দ্র করে কয়েকশ অতি রক্ষণশীল ইহুদি ও ইসরায়েলি অ্যাক্টিভিস্ট আল-আকসা পরিদর্শনে যান। হামাস অভিযোগ তুলে বলে, আল-আকসায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তি লঙ্ঘন করে ইহুদিরা সেখানে প্রার্থনা করতে গিয়েছিল। ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের ওপর নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ এই উত্তেজনায় নতুন করে ঘি ঢালে। গাজা সীমান্তে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

গাজায় ১৭ বছরের অবরোধ শিথিল করতে কাতার, মিসর ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের ওপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা ছিল হামাসের। ২০০৯ সাল থেকে সমুদ্রপথে গাজার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। এ কারণে ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপে আছে গাজার ২০ লাখের বেশি বাসিন্দা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা হামাসের হামলার অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে বলে কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন।

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিম রাষ্ট্র গুলো

আরবরা কোথায়? আরবরা কোথায়?

ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে ধসে যাওয়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে, মৃত শিশুদের কোলে তুলে ক্যামেরার সামনে অসহায়ভাবে চিৎকার করে এই একটাই প্রশ্ন করছেন গাজাবাসীরা। কেন আরব প্রতিবেশীরা ইসরায়েলি বোমা হামলা থেকে তাদের রক্ষা করছে না?

গত বছরের ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলায় ১২০০ ইসরায়েলি নিহত এবং আড়াইশ জনের মতো অপহৃত হয়েছিল।

তারপর থেকে সবার দৃষ্টি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। সবার মনে প্রশ্ন ছিল ইসরায়েল কতোটা তীব্রভাবে এর প্রতিশোধ নেবে আর এ অঞ্চলের আরব দেশগুলোর জনগণ ও সরকারের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

আজ অবধি, প্রথম প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে পুরো গাজা উপত্যকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

এ পর্যন্ত ৪৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে তারা এবং এই ধ্বংসযজ্ঞ আর হত্যাযজ্ঞ থামার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি আরব বিশ্বের রাজধানীতে গণবিক্ষোভ হবে বলে আশা করে, তবে তারা হতাশ হবে।

আরব দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন ও সংহতির অনুভূতি থাকলেও এসব দেশে বলতে গেলে কোন বিক্ষোভই হয়নি।

কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ওয়ালিদ কাজিয়া বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, "আরব দেশগুলোর সরকারের প্রতিক্রিয়া খুবই হতাশাজনক এবং না থাকার মতো ।"

"ইসরায়েলের প্রথাগত সমালোচনা ছাড়া এবং কাতার ও মিশরের সরকারের পক্ষ থেকে সংঘাতে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব ছাড়া, কেউ ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নেয়নি," তিনি বলেন।

কাজিয়া বলেন, কোনো আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি বা এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি যা ইসরায়েলের ওপর কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ বাড়াবে বা যুদ্ধ বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

কিন্তু ফিলিস্তিন ইস্যু কেন এই অঞ্চলে গুরুত্ব হারালো? মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বিবেচনায় এ প্রশ্নের উত্তর বেশ জটিল।

সরকারের ও জনমত বিচ্ছিন্ন

এই অঞ্চলের সরকার ও জনমত কখনই অটুট এবং সমভাবাপন্ন ছিল না।

ইতিহাসজুড়ে দেখা যায়, আরবরা একটি পরিচয়, একটি ভাষা এবং বহুলাংশে একটি ধর্মের সাথে জুড়ে রয়েছে। এই অঞ্চলে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে আরবের সবাই উদ্বিগ্ন ছিল। তবে আরবের বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর স্বার্থ কখনো কখনো অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

ফিলিস্তিনিদের সাথে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক এতোটা সহজ ছিল না, বিশেষ করে তাদের সাথে যারা ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার পর বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে স্বাগত জানিয়েছিল।

লেবাননের গৃহযুদ্ধ, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী ও জর্ডানের রাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত এই অঞ্চলের সংঘাতের পুরনো ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়।

তবে ফিলিস্তিন ইস্যুটি কয়েক দশক ধরে আরব দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ হয়ে ওঠে।

দোহা ইন্সটিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের পাবলিক পলিসির সহযোগী অধ্যাপক তৈমুর কারমুত বিবিসি মুন্ডোকে বলেছেন, "এই সময়ে, ইসরায়েলি রাষ্ট্রকে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তির সম্প্রসারণ হিসাবে দেখা হচ্ছে। এই ঔপনিবেশিক শক্তি মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরে গেলেও ইসরায়েলকে তার স্বার্থ রক্ষার এজেন্ট হিসেবে রেখে গিয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র"।

বিশ্লেষকরা বলছেন, অতীতে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের মতো দেশগুলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি নিজেদের জাতীয় স্বার্থও রক্ষা করেছে।

যাই হোক, সেই যুদ্ধগুলো এখন কেবলই অতীত। মিশর ও জর্ডান কয়েক দশক আগে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছে।

মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অথচ কয়েক বছর আগেও ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক রাখাকে এই অঞ্চলে ন্যক্কারজনক বলে ধরা হতো।

৭ই অক্টোবর সংঘাত শুরুর আগে সৌদি আরবও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কাছাকাছি চলে যায়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজারেন সেন্টার ফর ইসরায়েল স্টাডিজের পরিচালক ডভ ওয়াক্সম্যানের মতে, "সাম্প্রতিক সংঘাতের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বহু দশক ধরে, প্রতিটি আরব দেশ তাদের নিজস্ব স্বার্থ নিয়েই ছিল।

তারা ফিলিস্তিনিদের সমর্থন এবং সংহতির কথা বললেও, তারা তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

চাথাম হাউসের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা প্রোগ্রামের গবেষক ইলহাম ফাখরো বলেছেন, আরব বিশ্বের জনমত দৃঢ়ভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে।

তিনি বলেছেন, গাজার বিপর্যস্ত নাগরিকদের প্রতি আরব দেশগুলোর জনগণের অনেক সহানুভূতি রয়েছে এবং তারা চায় তাদের সরকার ফিলিস্তিনিদের জন্য আরও কিছু করুক।

তারা চায় তাদের দেশ ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং অন্ততপক্ষে তাদের দেশ থেকে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করুক। কিন্তু এমনটা হয়নি।

ওয়াশিংটন ডিসিতে আরব সেন্টার থিংক ট্যাঙ্কের গবেষণা ও বিশ্লেষণের পরিচালক ইমাদ হারবের মতে, "আরব সরকার অনেক আগেই ফিলিস্তিনিদের পরিত্যাগ করেছে।"

আরব বসন্তের কম্পন

তৈমুর কারমুতের মতে, আরব বসন্ত হল মধ্যপ্রাচ্যের এক মোড় ঘোরানো ইতিহাস যা ওই অঞ্চলের সমগ্র দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে: ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশ কাঁপানো জনপ্রিয় বিদ্রোহ 'আরব বসন্ত' নামে পরিচিত।

"আরব বসন্তের পর থেকে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে এবং এই বিদ্রোহের ব্যর্থতা অঞ্চলটিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে," জানান কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক।

ইয়েমেন, সিরিয়া বা ইরাকের মতো অনেক দেশ এখনও গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত। সিরিয়া ও ইরাক, যারা কিনা মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রীয় ও শক্তিশালী দেশ ছিল এবং যারা রাজনৈতিক মতাদর্শ দিয়ে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত, আজ তারা দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

লিবিয়া অদৃশ্য হয়ে গেছে, মিশর অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে রয়েছে এবং সুদান গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত।

কারমুত নিন্দা করে বলেছেন যে, এই স্থায়ী সঙ্কটের মধ্যে আরব সমাজ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে অসহায় বোধ করে, কেননা তারা নিজেরাই নিপীড়ক, স্বৈরাচার ও একনায়কত্বের অধীনে বাস করছে।

আরব বিশ্ব শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে, মানুষের স্বাধীনতা বা মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই নেই।

তা সত্ত্বেও, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সরকারের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, যদিও এই প্রতিক্রিয়া মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেন্দ্রিক।

আরব বসন্তের পর থেকে এ অঞ্চলের অনেক দেশের রাস্তায়, যেমন মিশরের রাস্তায় আন্দোলন সংগ্রাম বন্ধ করে দেয়া হয়।

যেখানে একসময় স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় বিক্ষোভ করতে এবং তাদের হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দিতো, আজ তারা আশঙ্কা করছে যে এই ধরনের বিক্ষোভ তাদের অন্য কিছুর দিকে ঠেলে দেবে।

আরব বসন্ত শুধু এই ভাবনায় পরিবর্তন এনেছিল এমনটি নয়। আরো অনেক দিকেই দৃশ্যপট বদলে যায়।

আরব বসন্তের সেই অশান্ত বছরগুলোয় লাখ লাখ আরব তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া, বাহরাইন এবং মরক্কোর মতো দেশে গণতন্ত্র ও সামাজিক অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল।

"আরব বসন্ত সত্যিই প্রবল এক কম্পন ছিল যা অনেক দেশের পরিস্থিতি এবং অগ্রাধিকার পরিবর্তন করেছে," বলেছেন তৈমুর কারমুত।

এই আরব বসন্ত কিছু পুরানো শাসনের পতন ঘটায় এবং অন্যরা ভাবতে থাকে যে তাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে চলেছে, এমন অবস্থায় তারা আতঙ্কিত হয়ে সুরক্ষা চাওয়ার জন্য এদিক ওদিক তাকাতে থাকে ।

"অনেকেই বিশ্বাস করতো যে আমেরিকা তাদের এই বলে বোকা বানাচ্ছে যে ইসরায়েল এই অঞ্চলের মিত্র যে তাদের রক্ষা করতে পারে।"

আরব বসন্তের মাত্র কয়েক বছর পর, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন, বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি করে। ওই চুক্তিতে পরে মরক্কো ও সুদান যোগ দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া জানাতে বেশি সময় নেয়নি, ওয়াশিংটন পশ্চিম সাহারার উপর মরক্কোর সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যার ফলে স্ব-নিয়ন্ত্রণের উপর গণভোট অসম্ভব হয়ে পড়ে।

"যখন আমরা ইসরায়েলের সাথে এই দেশগুলোর সম্পর্ক স্থাপনের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে ইসরায়েল ওইসব দেশের নিজস্ব লোকদের উপর গোপনে নজরদারির জন্য তাদের নজরদারি সিস্টেম বিক্রি করেছে," ওয়ালিদ বলেন।

ইসরায়েলি কোম্পানি এনএসও গ্রুপের তৈরি পেগাসাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন এবং এমনকি সৌদি আরবকে দায়ী করা হয়, যদিও ইসরায়েলের সাথে এর কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নেই।

নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, রিয়াদ ২০১৭ সালে প্রোগ্রামটি কিনেছিল এবং পরের বছর ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে সৌদি বিরোধী সাংবাদিক জামাল খাশোগজিকে হত্যার পর তারা এর ওপর থেকে তাদের অ্যাক্সেস হারায়।

যাইহোক আমেরিকান সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান পরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করেন। যার কারণে তিনি সফটওয়্যারটিতে নিজেদের অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

ইসলামি চরমপন্থীদের ভয়:

জাতীয় স্বার্থ ছাড়াও আরেকটি বিষয় যা আরব দেশগুলোকে ফিলিস্তিন ইস্যু থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল তা হলো নিজ নিজ দেশে ইসলামি মিলিশিয়াদের উত্থান।

অধ্যাপক ওয়ালিদ কাজিয়ার মতে, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর এবং ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বের সময়কালে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রথম তরঙ্গকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখা হতো, তবে এখনকার প্রতিরোধের মূল ভিত্তি হল 'ধর্ম'।

"আজকে যারা ফিলিস্তিনের জন্য লড়াই করছে তারা মূলত ইসলামপন্থী, তা হামাস হোক বা হেজবুল্লাহ যেই হোক না কেন। তাদের ধারণা ইসলাম থেকে এসেছে, যেমন শাহাদাত।"

ইসলামপন্থী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে হামাসের সম্পর্ক রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুড আরবের বেশ কয়েকটি সরকারের সাথে সংঘাতে জড়িত। তার কারণে এই সরকারগুলোর অনেকেই হামাসকে হুমকি হিসাবে দেখে।

"তারা হামাসকে মুসলিম ব্রাদারহুডের শেষ ঘাঁটি হিসাবে দেখে যা এখনও টিকে আছে এবং হামাস সামরিকভাবে শক্তিশালী," বলেছেন কারমুত।

দোহা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক যোগ করেছেন যে, ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের নোংরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরানের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ

ইরানের সাথে হামাস ও হেজবুল্লাহর যোগসূত্র আরব দেশগুলোতেও সন্দেহের জন্ম দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্য ইরান, ইসরায়েলের চেয়েও বড় হুমকি।

ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সেখানে ইসরায়েলের চেয়ে বড় হুমকি হলো ইরান।

অনেক আরব সরকার ''ইসরায়েল এবং আমেরিকানদের এই বক্তব্য মেনে নিয়েছে যে, এসব গোষ্ঠী হলো ওই অঞ্চলে ইরানের একটি 'ছায়া সংগঠন' এবং ফিলিস্তিনিদের কথা না ভেবে আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যই তাদের তৈরি করা হয়েছে,'' যুক্তি দিচ্ছেন কারমুত।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি আরব বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদমাধ্যমের প্রচারিত বর্ণনা। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য এমন একটি অঞ্চল যেখানে স্বাধীন মিডিয়া খুব কমই রয়েছে।

"উদাহরণস্বরূপ, সৌদি মিডিয়ার জন্য, প্রধান চিন্তার বিষয় ফিলিস্তিনিরা নয়, বরং ইরানীরা কীভাবে এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছে তাদের কাছে এটাই গুরুত্ব রাখে," বলেছেন অধ্যাপক ওয়ালিদ কাজিয়া।

কারমুত স্বীকার করেছেন যে, হামাস এখনো ইরানের কাছ থেকে সমর্থন এবং আর্থিক সাহায্য পায়। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীটি যখন তৈরি হয় তখন বেশ কয়েকটি আরব দেশের সাথে তাদের ভাল সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন দেশগুলো এই তৎপরতার ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তিনি আরও বলেছেন, যখন আরব দেশগুলি তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ইসরায়েলের সাথে লড়াই করার জন্য কেউ হামাসকে অস্ত্র দিতে চায়নি।

তাই অস্ত্র পাওয়ার জন্য তারা যেকোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে রাজি ছিল।

একই কথা হেজবুল্লাহ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ইরানের সমর্থন পাচ্ছে একইসাথে তারা ফিলিস্তিনিদেরও রক্ষা করতে চায়।

যখন ইরান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সামনে চলে এলো, তখন আরব দেশগুলোর বাসিন্দারা আলোচনার মধ্যে আর রইলো না।

''আমি মনে করি, আরবে বেশ কিছু সংগঠন আছে, যারা সত্যি সত্যি ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করতে চায়, এমনকি তাদের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। যেমন ধরুন হেজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি এবং ইরাকের কিছু শিয়া সংগঠন।''

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তন:

ভূ-কৌশলগত স্বার্থ এবং আরব দেশগুলোর সংকট ছাড়াও ফিলিস্তিন ইস্যুটি সময়ের সাথে সাথে মিলিয়ে গিয়েছে।

আরব জাতীয়তাবাদের মতো যে ধারণাগুলো একসময় মধ্যপ্রাচ্যের মানুষেরা হৃদয়কে ধারণ করতো, সেগুলো এখন অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র।
"এই অঞ্চলের বেশিরভাগ তরুণ প্রজন্ম ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু তারা সংঘাতের কারণ এবং উৎস জানে না কারণ এই বিষয়গুলো আর স্কুলে পড়ানো হয় না," কারমুত ব্যাখ্যা করেন।
আজ, বিশ্বায়নের সাথে সমাজ এমনকি পরিচয়ও বদলে গেছে। নতুন নেতাদের ক্ষেত্রেও তেমনই কিছু ঘটেছে।
"উদাহরণস্বরূপ, উপসাগরীয় দেশগুলোতে, যেমন সৌদি আরবে মোহাম্মদ বিন সালমানের মতো নতুন প্রজন্মের নেতা এসেছেন, যারা বেশিরভাগই পশ্চিমে শিক্ষিত, যারা আরব নন এবং তারা ফিলিস্তিনকে কোন সমস্যা হিসাবে দেখেন না," বলেছেন কারমুত।'
"এখন তাদের অগ্রাধিকারের পাশাপাশি আকাঙ্ক্ষাও বদলে গিয়েছে," তিনি বলেন।

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিম উম্মার করনীয়

যদি পাহাড়গুলোর কলিজা থাকত তবে তা টুকরা হয়ে যেত। যদি গাছগুলোর চোখ থাকত তবে আশ্চর্যের কিছু ছিল না যে তা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নদী বইয়ে দিত। যদি পৃথিবীর বাকশক্তি থাকত, তবে তার আর্তনাদ ও কান্নায় পৃথিবী কেঁপে উঠত। যদি হিংস্র পশুরা মানুষরূপী পশুদের দেখত তাহলে তারাও হয়তো এদের বর্বরতার কাছে লজ্জিত হয়ে আত্মসমর্পণ করত।
গাজায় বছরের পর বছর যে বর্বরতা ও রক্তপাত চলছে, যেভাবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে নামধারী মুসলিম শাসকদের মদদে মুসলমানদের জন্য জেলখানা বানানো হয়েছে, তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে—তা দেখে প্রকৃতিও হয়তো নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না।
সেসব মুক্তিকামী যোদ্ধাদের মহান আল্লাহ সাহায্য করুন, যাঁরা ইসলাম নামক পবিত্র বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখতে তার মূলে নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শতসহস্র রহমত বর্ষিত হোক সেসব শহীদের ওপর, যাঁরা নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য লড়ে গেছেন। এর বিপরীতে যারা নিরীহ মানুষের ওপর জুলুম করছে, মহান আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন।
অন্যথায় মহান আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী তাদের দমন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
এখন প্রশ্ন হলো, যেসব মুসলিম তাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের নৈতিকভাবে সমর্থন দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, তাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? নবীজি (সা.) তাঁর হাদিসে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু সাঈদ আল খুদরি (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের

কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা করবে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

(মুসলিম, হাদিস : ৮১)

পৃথিবীতে জুলুম-অত্যাচার সবচেয়ে বড় পাপের একটি। কখনো কখনো তা শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ। কেননা যারা আগে থেকেই জন্ম থেকে মুশরিক তাকে হত্যা করার বিধান নেই, তবে কেউ যদি জুলুম করে কাউকে হত্যা করে, তাহলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাকেও কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। তাই কোথাও জুলুম হলে মুমিনের উচিত, নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সেই জুলুমের প্রতিবাদ করা। তাদের বিরোধিতা করা।

বিরোধিতার একটি বহিঃপ্রকাশ হলো অত্যাচারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এই শিক্ষা স্বয়ং মহান আল্লাহ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।' (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৫১)

এখানে মহান আল্লাহ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ আন্তরিকতা, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্ক ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো জুলুমের প্রতি অসমর্থন প্রদর্শনের মাধ্যম। আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ জুলুমের কথাও উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ যেসব ইহুদি-নাসারা জুলুমে লিপ্ত থাকবে, মুসলমানদের দায়িত্ব হবে নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরোধিতা করবে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কোনোভাবেই তাদের কোনো সহযোগিতা করবে না। অন্য আয়াতে এ বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ শুধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বিনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো অত্যাচারী।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৯)

আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ জুলুমের কথাও উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ যেসব ইহুদি-নাসারা জুলুমে লিপ্ত থাকবে, মুসলমানদের দায়িত্ব হবে নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরোধিতা করবে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কোনোভাবেই তাদের কোনো সহযোগিতা করবে না। অন্য আয়াতে এ বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ শুধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বিনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো অত্যাচারী।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৯)

অর্থাৎ যারা মুসলমানদের সঙ্গে দ্বিনের ব্যাপারে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, মুসলমানদের তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়, তাদের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক। কেউ যদি সামাজিক স্বার্থে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা থেকে বিরত থাকে, তাহলেও সে-ও কোরআনের এই নির্দেশনাগুলোর বিপরীত কাজে লিপ্ত হলো। তবে যদি কোনো ইহুদি-নাসারা এমন হয় যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচিতে লিপ্ত নয়, মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে না, তাদের কথা ভিন্ন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)
অর্থাৎ যেসব অমুসলিম ভাই ইনসাফের ওপর থাকবে, মুসলমানদের ওপর আক্রমণাত্মক মনোভাব রাখবে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবে না, তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না, তাদের সঙ্গে বৈরিতা নয়। তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা যাবে এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা যাবে, বরং তাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা জায়েজ নয়।
সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে সেসব অমুসলিমের সঙ্গে, যারা ইসলাম ও মুসলমানের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে। কারণ তাদের সঙ্গে যতই ভালো ব্যবহার করা হোক, তাদের স্বার্থ পূরণ করা হোক, তারা মুসলমানদের ওপর কখনো খুশি হবে না। যতক্ষণ মুসলমান তার ঈমান থেকে সরে আসবে না, ততক্ষণ তারা মুসলমানকে মন থেকে ভালোবাসবে না।
এই পরিস্থিতি যেমন নবীজি (সা.)-এর যুগে ছিল, তেমন এখনো আছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, 'ইহুদি-খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করো। বলো, আল্লাহর দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ আর তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১২০)
তাই আমাদের উচিত দখলদার ইসরায়েল ও তাদের মদদদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। রাজনৈতিক, ব্যাবসায়িক থেকে শুরু সব অঙ্গনে তাদের বয়কট করা। ফিলিস্তিনিদের ওপর তাদের আগ্রাসনের তীব্র বিরোধিতা করা। মহান আল্লাহর কাছে ফিলিস্তিনের মজলুম জনতার জন্য দোয়া করা। এটাই আমাদের মানবিক ও ঈমানি দায়িত্ব।